ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম : রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান : বাণী ও সুর বৈচিত্র্য

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা শিরোনাম

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান : বাণী ও সুর বৈচিত্র্য

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা

অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

আহমেদ শাকিল হাসমী

পিএইচ.ডি গবেষক

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮

রোল : ১৪৫

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ, গবেষক রোল: ১৪৫, **'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান : বাণী ও সুর বৈচিত্র্য'** গবেষণাটি সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য প্রণীত অভিসন্দর্ভ। আমার জানামতে গবেষণাকর্মটির কোনো অংশ পূর্বে প্রকাশ হয় নি বা প্রকাশের জন্য কোথাও জমা দেয়া হয় নি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত ও উপস্থাপিত হলো।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের গবেষণায় কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা)
অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান : বাণী ও সুর বৈচিত্র্য** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব একটি মৌলিক রচনা। অভিসন্দর্ভটি সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। যার কোনো অংশ প্রকাশ হয় নি বা প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয় নি।

আরো ঘোষণা করছি যে, আমার গবেষণায় কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

গবেষক

(আহমেদ শাকিল হাসমী)
পিএইচ.ডি গবেষক
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮
রোল : ১৪৫
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অদম্য আগ্রহ আর স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম সরকারী সংগীত কলেজে; তারপর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্র সংগীতে বি.মিউজ ও এম.মিউজ সম্পন্ন করি। তবে অনেক আগে থেকেই সংগীতের প্রতি যে দুর্বার আকর্ষণ তার পিছনে ছিল আমার বাবার অনুপ্রেরণা এবং শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন বিদ্যানুরাগী মা। আজ কৃতজ্ঞতার পাশে টেনে তাঁদের অফুরন্ত দানকে খাটো করতে চাই না। **'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান : বাণী ও সুর বৈচিত্র্য'** শিরোনামে এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে যাঁরা আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের অবদান স্বীকার করছি কৃতজ্ঞচিত্তে। প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক **ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা**, অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতি। যিনি গবেষণার বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে গবেষণার সার্বিক বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর আন্তরিক অনুপ্রেরণা ও মুহুর্মুহু তাগিদে এমন গবেষণাকর্মের মতো দুরূহ কাজ শেষ করা সম্ভবপর হলো। আন্তরিক ঋণ স্বীকার করছি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথে ঠাকুরের এর প্রতি। তাঁর জীবন ও সৃষ্টি আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে এবং গবেষণার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি দেশবরেণ্যে নজরুল গবেষক ড. রশিদুন্ নবী স্যারের প্রতি যিনি গবেষণাকর্ম চলাকালে নানারকম পরামর্শ উৎসাহ দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। একই সঙ্গে অধ্যাপক ড.সফিকুন্নবী সামাদী ও অধ্যাপক ড.জাহিদুল কবীর নানাভাবে সহযোগিতা করেন। অশেষ ঋণ স্বীকার করছি আমার কর্মক্ষেত্র সংগীত বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী ও সংগীত বিভাগে কর্মরত সেকশন অফিসার নজরুল ইসলামের প্রতি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বিভাগীয় প্রধান টুম্পা সমদ্দার, বর্তমান বিভাগীয় প্রধান দেবপ্রসাদ দাঁ, আজিজুর রহমান তুহিন-সহ বিভাগের সকল শিক্ষক, সহকারী রেজিস্ট্রার জনাব স্বরাজ কুমার দেব এর প্রতি। আমার প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র/ছাত্রীদের ভালোবাসায় পাশে রাখতে চাই; আশিক সরকার তুষার, মো. মামুনুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মো. রওশন আলম প্রিন্স-কে। যারা আমার গবেষণার বড় একটা অংশের অনুসন্ধিৎসু চিন্তার সৃজনশীল সহযাত্রী ছিলেন। সহযোগিতায় পাশে ছিলেন ফয়জুল আলম পাপপু, মাহফুজুর রহমান, মুজাহিদুল ইসলাম, ফকির সাজ্জাত ও মো. সালাউদ্দীনসহ আমার ভাইবোন ও আমার সন্তান অভিনন্দন হাসমী। গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতের শুরু থেকে সংগীত বিষয়ে দেশবিদেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকর্ম, বইপত্র, প্রবন্ধ সংগ্রহ ও শেষ মূহুর্তে কম্পিউটার কম্পোজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমার প্রিয় ছাত্র তরুণ গবেষক মো. তারেকুল ইসলাম। তার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	**০১-০৬**
প্রথম অধ্যায়	**০৭-২৮**
স্বদেশ পর্যায়ের গানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	
দ্বিতীয় অধ্যায়	**২৯-৭৬**
স্বদেশ পর্যায়েরর গানের বাণী পর্যালোচনা	
তৃতীয় অধ্যায়	**৭৭-১৫০**
স্বদেশ পর্যায়েরর গানের সুর-বৈচিত্র্য	
চতুর্থ অধ্যায়	**১৫১-১৬৯**
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের তাল পর্যালোচনা	
পঞ্চম অধ্যায়	**১৭০-১৮৩**
তুলনামূলক পর্যালোচনা	
উপসংহার	**১৮৪**
পরিশিষ্ট	**১৮৫-২৩৬**
গ্রন্থপঞ্জি	**২৩৭-২৩৯**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাঙালির মননে ও ভাবচেতনায় বেড়ে ওঠা এক অনন্য প্রতিভার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর শিল্পচেতনায় বাঙালির জীবনাচরণের গভীর উপলব্ধিগত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা চিত্রিত হয়েছে। তাঁর রচনায় সমাজসংস্কারের নানা বিষয়ও উঠে এসেছে প্রতিনিয়ত। শিল্পের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর সচেতন বিচরণ বিদ্যমান ছিল। উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, চিত্রকলা ও সংগীত সব বিষয়ই শিল্পমানে উত্তীর্ণ ছিলো। তবে সবকিছু ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল পরিচয় তিনি কবি। সমালোচকরা মনে করেন- রবীন্দ্রনাথের কবি মানসিকতা তাঁর সমগ্র সৃষ্টির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। বিশেষ করে সংগীত সৃষ্টিশৈলীতে এর প্রভাব প্রবল ছিলো। কবিত্ব শক্তি ও সাংগীতিক দখল; এ দুই মিলে তাঁর গান হয়ে উঠেছিলো অনন্য। লক্ষণীয় যে-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সংগীতের যে রূপ-রীতি-ধারা-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছিলেন তার উদ্ভব বিকাশ ও বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় তিনি নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি তথা বিশ্বকবি হলেও তাঁর সমগ্র শিল্পের মাঝে এক অনবদ্য সৃষ্টির উদাহরণ হয়ে উঠেছে সংগীতসম্ভার। তাই তাঁর সংগীতের বাণী, ভাব, সুর ও ছন্দের ঐক্যতান বিশ্বময় অজস্র ভোক্তার হৃদয়ে সার্বজনীন ও সময়োপযোগী শিল্পান্বেষার যোগান দিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোট গানের সংখ্যা ২২৩২ টি। কবি নিজেই গীতবিতানের দ্বিতীয় সংস্করণে 'ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে' ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। এ পর্যায়গুলো হলো- পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক প্রভৃতি। এই পর্যায়ভুক্ত গানের সংখ্যায় পূজা পর্বে ৬২৯ টি, স্বদেশ পর্বে ৪৬ টি, প্রেম পর্বে ২৪৮টি, প্রকৃতি পর্বে ২৮৩ টি, বিচিত্র বিষয়ে ১৪০ টি, আনুষ্ঠানিক পর্বে ২১ টি, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী পর্বে ২০ টি, নাট্যগীত পর্বে ১৩২ টি, জাতীয় সংগীতরূপে ১৬ টি, পূজা-প্রার্থনা বিষয়ক পর্বে ৮৩ টি এবং প্রেম-প্রকৃতি বিষয়ক পর্বে ১০১ টি গান পাওয়া যায়। এই পর্যায়ভুক্ত গানগুলোর মধ্যে বক্ষমাণ গবেষণার আলোচ্য বিষয়- শুধু রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানের বাণী ও সুর-বৈচিত্র্য। ঐতিহাসিক দিকে থেকে স্বদেশ পর্যায়েরর গান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, লর্ড কার্জনের ঘোষিত ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথে সৃষ্ট স্বদেশী গানগুলি বাংলা স্বদেশ পর্যায়েরর গানের শ্রেষ্ঠ ফসল হিসেবে বিবেচ্য।বিশ্ব সংগীতের ইতিবৃত্তে সামগ্রিকভাবে বাংলা সংগীতের গৌরবময় অবস্থান পরিলক্ষিত হলেও স্বদেশী সংগীতের প্রভাব ও বিস্তার রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তেমনভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে নি। অর্থাৎ প্রাচীন চর্যাকারদের কাব্য সংগীত থেকে রামপ্রসাদের গান পর্যন্ত প্রায় সাতশ বছরের সংগীতচর্চার ধারায় স্বদেশ সম্পর্কিত কোনো গীত বাক্য কিংবা উল্লেখযোগ্য নির্দশন পাওয়া যায় না। তবে মধ্যযুগের বিখ্যাত বাঙালি কবি আবদুল হাকিম

(১৬২০-১৬৯০) 'নূরনামা' কাব্যে লিখেছেন বিখ্যাত বঙ্গবাণী কবিতা। যে কবিতায় কবি বলেছেন বাংলায় জন্ম নিয়েও যারা বাংলা ভাষার ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তাদের জন্মসূত্র নিয়ে সন্ধিহান। অপরদিকে এ বিষয়ে সংস্কৃত রামায়নের উক্তি প্রণিধানযোগ্য 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' অনুবাদ "মা (জননী) ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেয়।" কিন্ত তৎকালীন সময় উক্ত বাক্যেটি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে কারণ সংস্কৃত ভাষায় Patriotism (দেশপ্রেম) এর কোনো প্রতিশব্দ নেই। অপরদিকে ঐতিহাসিক বিচারে উনিশ শতকের প্রারম্ভে উপমহাদেশের প্রথম স্বদেশী গানের সূচনা করেন যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর অনুসারীরা। পরবর্তীতে উক্ত শতকের মধ্যভাগে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বদেশী গানের ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধকারী সর্বাধিক দেশাত্মবোধক গান করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজণীকান্ত সেন প্রমুখ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় রচনা করেছিলেন। বৃটিশ শাসনের ক্রান্তিলগ্নে স্বদেশী গান রচনার অধিকতর বিস্তার ঘটেছিল। জিনগতভাবে আমাদের মাঝে মাতৃভূমির প্রতি স্নেহশীল অনুভূতি ও মায়া-মমতার আকুতি জন্মলগ্ন থেকে বিদ্যমান থাকে। এ অনুভূতি আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় যখন মাতৃভূতি কোনো পরাধীনতার ঝঞ্ঝায় পতিত হয়ে পড়ে। তাই বৃটিশদের শোষণ, অত্যাচার ও নির্যাতন ভারতবাসীকে সংগ্রামের পথে অগ্রসর করে। পরাধীনতার গ্লানিই ভারতকে মুক্তির পথ দেখায়। চোখের সামনে ঘটমান নিপীড়ন সংগ্রামী হয়ে উঠতে সহযোগিতা করে। স্বদেশী গানের প্রেক্ষাপটের সাথে রাষ্ট্র, ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক চেতনা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিল। যার ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বদেশী গানের শৈল্পিক প্রকাশ মাত্রায় জাতীয় ঐক্য ও মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন। বাংলা স্বদেশী গানের মধ্যে মূলত চারটি ধাপ দেখা যায়; যথা- প্রাক হিন্দুমেলা, হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ পর্যায় ও বঙ্গভঙ্গত্তোর পর্যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম দিকের গানগুলো নিয়মবদ্ধ গঠন-রীতির অনুকরণ তথা প্রচলিত রাগ-রাগিনীর অনুসরণে সৃষ্টি করেন। কিন্তু পরবর্তীতে প্রচলিত সুরের সুনির্দিষ্ট ধারায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে তিনি ক্রমান্বয়ে নিজস্ব সুর সৃষ্টিতে মনোযোগী হন। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই সুরপ্রয়োগের ক্ষেত্রে বাণীর ভাব প্রকাশকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে ভাব প্রকাশের বাহন রূপে সুরের সুসামঞ্জস্য বিস্তার ঘটে। এ জন্য তাঁর গানে রাগ প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাগের মিশ্রণ প্রক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে তিনি স্থানভেদে ভাব সংযুক্তির জন্য একক রাগের সাথে সমপ্রকৃতি ও সম্পূর্ন বিপরীত রাগের স্বরযোজনাও করেছেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীতসম্ভারের মধ্যে শুধুমাত্র স্বদেশী গানের সুর বিশ্লেষণে দেখা যায় এতে শাস্ত্রীয় রাগের পাশাপাশি

ঐহিত্যবাহী বাংলা লোকসংগীতের মিলন বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াও বেশকিছু গানে পাশ্চাত্য সুরের চলন ফুটে উঠেছে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ নানা গ্রহণ-বর্জনের মধ্যদিয়ে নিজের স্বকীয়তা গড়েছিলেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও সুরশৈলীকে তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মবদ্ধ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ করেন নি। যার ফলে রবীন্দ্র সংগীত তিল তিল করে তিলোত্তমায় রূপ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের সুর-বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধিত করলে ধ্রুপদ, খেয়াল, রামপ্রসাদী, কীর্তন, টপ্পা, সারি, ও বাউল অঙ্গসহ বিচিত্র সুরশৈলীর মিশ্রন ও প্রয়োগ দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গান রচনায় বাস্তবতার সাথে কল্পনা ও ভবিষ্যদ্বাণীর বিশেষ যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। যা তীব্রতম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সুর সংযোজনে। রবীন্দ্রনাথ গানের বাণীকে উপমহাদেশীয় অন্যান্য সংগীতকারদের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা বাণী মানব মনের বহুমাত্রিক অনুভূতি প্রকাশের সহায়ক বা বাহন। উল্লেখ্য, মানুষের হৃদয়বৃত্তিক অস্তিত্বের দুটি দিক- একটি দেহগত ও অন্যটি আত্মিক। অর্থাৎ দেহগত বিষয় দৃশ্যমান এবং আত্মিক বিষয়টি অদৃশ্য। তদ্রুপ কবিগুরুর গানের বাণীতে দুটি দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। প্রথমটি দৃশ্যমান ও দ্বিতীয়টি আত্মিক, যাকে বলা যায় দৃষ্টির অগোচরের ঘটনা। ফলে রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে উঠে অনুভূতিজাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের বাণীকে কবিতার ন্যায় কাব্যময় সাহিত্যশৈলী বলে আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন তাঁর গানের বাণী নেহাত কাব্যিক হলেও তা সুর ও ছন্দের মাধ্যমেই শ্রুতিশৈলীর আকাঙ্খা সৃষ্টি করে। তিনি গানকে কবিতার সাথে তুলনা করলেও স্বদেশ পর্যায়ের গানে কবিতার মতো প্রতীক-উপমা-রূপক-রূপকল্পকে প্রাধান্য দেন নি বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যে কারণে রবীন্দ্রনাথের গানগুলোর বাণী-বৈচিত্র্য আমাদের চিত্তে শ্রুতিশৈলীর স্বাদ ও আকাঙ্খা তৈরি করে। রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন বাঙালিকে সুখে-দুঃখে আমার গান গাইতেই হবে। অপরদিকে রবীন্দ্র গবেষক ও সমালোচকরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত একজন কবি হলেও গানের মধ্যদিয়েই তিনি নিজেকে আত্মপ্রকাশের সাধনায় ব্রতি ছিলেন । তবে বলে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান নিয়ে যে ভবিষ্যৎ বাণী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন তা সত্য প্রমাণিকত হয়েছে। কারণ তাঁর রচিত গানগুলো শুধু রবীন্দ্রযুগের শ্রোতা ও পাঠকদের কাছে সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং সমকালীন গায়ক, পাঠক ও শ্রোতার কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এর প্রধান কারণ তাঁর গানের বাণীর সাথে রয়েছে সুর ও ভাবের নিবিড় যোগসূত্র। যে যোগসূত্রের নিমিত্তে গানের প্রতিটি চরণ হয়ে উঠেছে শিল্পালঙ্কারের স্বার্থক শৈলী। তাই সংগীতশিল্পী, শ্রোতা ও পাঠকের এক বৃহৎ অংশ রবীন্দ্রসংগীতের শ্রবণ আর পাঠ তৃপ্তির উৎকর্ষতার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। রবীন্দ্রনাথ গান রচনার ক্ষেত্রে অধিক

সচেতন ও কৌশলী ছিলেন। সাধারণত গীতিকাররা যেখানে কথা বসায় সুর বের করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সেখানে সুর বসান কথা বের করার জন্য। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজ মন্তব্যে সুরকে প্রাধান্য দিলেও গানের বাণী বা চরণকে কখনোই নগণ্য মনে করেন নি। বরং তাঁর গানের বাণীকে গড়েছেন কাব্যরসের সমুন্নত বিস্তারে। অর্থাৎ বাঙলা সংগীতের ভাবদর্শনে সুর কথাকে খুঁজে সৃষ্টি করে এক মহাজাগতিক মহামন্ত্র। যে মন্ত্রের টানে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেন শিল্পী ও শ্রোতা। বাণী ও সুরের যখন সার্থক সন্ধি হয় ঠিক তখনই সংগীত হয়ে ওঠে উৎকর্ষ শিল্প। যদি গীত সৃষ্টিতে বাণী ও সুরের যথার্থ মিলন না ঘটে উৎকর্ষতার মানদণ্ডে তা হয় ব্যর্থ। তাই সুর যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনই গুরুত্ব বহন করে বাণী। অর্থপূর্ণ সুন্দর বাণী ছাড়া ভাব-রস সম্পন্ন শ্রুতিশৈলীর সার্থক সংগীত নির্মাণ দুরূহ হয়ে উঠে। মানুষের মুখের ভাষার সাথে শিল্পের ভাষার অনেকাংশেই পার্থক্য রয়েছে। কেননা নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের মতে সুন্দর কোনো কিছু প্রকাশই শিল্প। আর এই প্রকাশমাধ্যম যদি আকর্ষণীয় না হয়ে উঠে তাহলে তা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলোকে বিষয়-বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা- স্বদেশের রূপবর্ণনা, জাগরণমূলক, উদ্দীপনামূলক, প্রেরণামূলক ও মাতৃবন্দনামূলক গান। আবার উদ্দীপনামূলক গানগুলোকে দু'টি পর্যায়ভুক্ত করা যায়; যেমন- আত্মউদ্দীপনামূলক এবং ঐক্যউদ্দীপনামূলক গান। প্রকৃতির অপার লীলাভূমি এই ভূখণ্ড। এ ভূখণ্ডে ঋতুচক্রের পালা-বদলে চক্রাকারে প্রকৃতির নানা রং, রূপ, রস ও ঘ্রাণের ভিন্নতা খেলা করে। তাই রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশের রূপ বর্ণনা' পর্যায়ের গানে বাংলার রূপ-বৈচিত্র্যের নিখুঁত বর্ণনা ফুটে উঠেছে। এ পর্যায়ের গানগুলোর মধ্যে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি", "ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা", "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে", "অয়ি ভূবনমনোমোহিনী" প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাগরণমূলক গান নিষ্ঠুরতা, বঞ্চনা, গভীর দহন থেকে মানব মনে প্রাণোচ্ছাসের নবচেতনা তৈরি করে। বিদ্রোহী চেতনা জাগিয়ে তুলতে গান হয়ে উঠে শাণিত অস্ত্র। তাই রবীন্দ্রনাথের 'জাগরণমূলক' গানগুলোতে কখনও ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, আবার কখনো কখনো লজ্জা নৈরাশ্য থেকে মানবকে জাগরণের আহ্বান করতে দেখা যায়। এই গানগুলোর মধ্যে "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো/একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো॥", "শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান/সব দূর্বল সংশয় হোক অবসান", "চলো যাই, চলো, যাই চলো, যাই/চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে", "আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে/কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া", "মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে/বর পুত্রসঙ্গ বিরাজ হে" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের গানে সরাসরি বিদ্রোহী চেতনা উপস্থিত না থাকলেও উদ্দীপনামূলক পর্যায়ের গানে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করতে দেখা যায়। তাঁর আত্মউদ্দীপনামূলক গানগুলো হলো- "আমি ভয় করব না ভয় করব না/দু বেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না॥", "আগে চল্, আগে চল্ ভাই! /পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে", "ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি", "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে", "ঘরে মুখ মলিন দেখে", "যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না/ তবে তুই ফিরে যা-না", "বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি/বারে বারে হেলিস নে ভাই", "ওরে, নূতন যুগের ভোরে/দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে" ইত্যাদি। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির ক্ষুদ্র চিন্তা-চেতনা ও চিত্তবোধের সমষ্টিগত উপলব্ধির ভাবাদর্শের আকাঙ্খায় ঐক্যউদ্দীপূনামূলক গানের মূল দর্শন নিহিত। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ভুক্ত ঐক্য উদ্দীপনামূলক গানগুলো হলো- "আমরা সবাই রাজা", "আমরা পথে পথে যাব সারে সারে","আমাদের যাত্রা হলো শুরু", "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে", "এবার তোর মরা গাঙে", "নিশিদিন ভরসা রাখিস", "এখন আর দেরী নয়" প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণামূলক গানগুলোতে জীবনবোধের সত্য-সন্ধানের ভাব সক্রিয় হয়ে উঠেছে তীব্রভাবে। স্বদেশ পর্যায়ের গানের একটি বড় অংশ এই প্রেরণার ভিত্তি হিসেবে নিহিত রয়েছে। এই পর্যায়ের গানগুলোর মধ্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে লক্ষ্য করা যায়- "যে তোরে পাগল বলে", "যদি তোর ডাক শুনে কেউ", "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে", "আমি ভয় করব না" ও "আপনি অবশ হলি" ইত্যাদি। মাতৃভূমির গুণকীর্তনমূলক গানই সাধারণত মাতৃবন্দনামূলক গান হিসেবে অভিহিত। এ ধারার গানের মূল উপাদান স্বদেশের রূপলীলার বন্দনা, স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা এবং মাতৃভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এ পর্যায়ের গানগুলোর মধ্যে রয়েছে 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে', 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, 'হে মোর চিত্ত', 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে', 'এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু', 'জননীর দ্বারে আজি ঐ' ইত্যাদি। উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপরিযুক্ত স্বদেশী সংগীতের পাঁচটি পর্যায়ের গানের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার কবল থেকে মুক্ত করতে অনুপ্রয়াসী ছিলেন। তাঁর শিল্পসাধনার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে যেমন সচেতন করেছেন তেমনি জনগণের মাঝে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছেন। হাতে অস্ত্র না তুলেও তিনি তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করবার সংগ্রাম করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গানে যেমন সুরের চেয়ে বাণীকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনই তাল প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। কেননা সংগীতশিল্পকে তিনি রাজনৈতিক ও স্বদেশ আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই স্বদেশ পর্যায়ের অধিকাংশ গানের সুরে বাউল বা লোকপ্রভাব এবং তালের ক্ষেত্রে দাদারা, কাহারবা ও একতালের অধিক প্রয়োগ বিদ্যমান। আবার

রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু গানে বিচিত্র ভাব প্রকাশে বিদেশী সুরের চলন অনুসরন করেছেন। প্রচলিত ধারা ভেঙ্গে সৃষ্টি করেছেন নতুন তাল ও ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে কিছু মুক্ত ছন্দের গান রচনা করেছেন। যেখানে নিয়মবদ্ধ তাল-এ গান গাওয়া না হলেও গানগুলোর স্বরলিপি নির্দিষ্ট তালেই বাঁধা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় সব তালেই তিনি গান রচনা করেছেন। তাল-বৈচিত্র্যের দিক থেকে ভারতবর্ষের আর কোনো সংগীতরচয়িতার গানে এতো গভীর নিরীক্ষার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। তিনি প্রচলিত কাহারবা, দাদরা তালের ব্যবহারেও নানা-বৈচিত্র্যের প্রয়োগ করেছেন। এছাড়াও তিনি ৬টি নতুন তাল সৃষ্টি করে করেছেন; যেমন ২/৪ ছন্দে ষষ্ঠি, ৩/২ ছন্দে ঝম্পক, ৩/২/৩ ছন্দে রূপকড়া, ৩/২/২/২ ছন্দে নবতাল, ৩/২/২/৪ ছন্দে একাদশী ও ২/৪/৪/৪/৪ ছন্দে নবপঞ্চ তাল। এ অভিসন্দর্ভে যে বিষয় সবচেয়ে বেশি যে বিষয় লক্ষ্য করেছি সেটি হলো রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানে অন্যান্য গানের তুলনায় সুরে তেমন পাণ্ডিত্য দেখান নি। আবার বাণীরও সরল রৈখিকতা বেশ লক্ষ্যণীয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীত সাধনার জন্য যে ভাব ও সুরের শৈল্পীক মিশ্রণ করেছেন তার প্রকৃষ্ট্য উদাহরণ এই স্বদেশ পর্যায়ের গান। সাধারণ জনগণের জন্যে সৃষ্ট গানগুলোর মধ্যদিয়ে সে সময় জাতির প্রাণে যে প্রাণসঞ্চার ঘটেয়েছিলেন তা এখনো বহমান। রবীন্দ্র সমকালীন ও পরবর্তী স্বদেশী গানের স্রষ্টা ও সাধকগণ যে রবীন্দ্রবলয়ে অনেকটা আবদ্ধ ছিলেন তার রূপরেখা বির্নিমাণও হয়েছে এ গবেষণায়।

গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের বাণী ও সুর-বৈচিত্র্যের নিমিত্তে প্রথম অধ্যায়ে 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের প্রেক্ষাপট', দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বাণী বিশ্লেষণ', তৃতীয় অধ্যায়ে 'সুর-বৈচিত্র্য', চতুর্থ অধ্যায়ে 'তাল- পর্যালোচনা এবং পঞ্চম অধ্যায়ে 'তৎকালীন অন্যান্য স্বদেশী সংগীত রচয়িতাদের সাথে তুলনামূলক আলোচনা বিশ্লেষিত হয়েছে। তবে সমগ্র গবেষণায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বাণী বিশ্লেষণ', তৃতীয় অধ্যায়ে 'সুর-বৈচিত্র্য', বিশ্লেষণই মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচ্য। পঞ্চম অধ্যায় তথা সামগ্রিক বিশ্লেষণপর্বে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের শিল্পমান, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং গবেষণার কাঙ্খিত ফলাফল বিশ্লেষিত হয়েছে। সামগ্রিকার্থে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের বাণী, সুর ও তালের তথ্য-উপাত্তের ব্যাখ্যাকৃত নিরীক্ষামূলক কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাঁনোই বক্ষ্যমাণ গবেষণার মূল অভিপ্রায়।

প্রথম অধ্যায়

স্বদেশ পর্যায়ের গানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলা গান হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। গানগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বাঙালি বিচিত্র চিত্তচেতনায় প্রেম মানবিকতায় গণমানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। মানুষের প্রেম মানবিক হৃদয়বৃত্তিক সৃজনশীল চেতনার মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি। এদের মধ্যে গণমানুষের চেতনাকে সবচেয়ে প্রবুদ্ধ করে স্বদেশপ্রেম। যা স্বদেশের প্রতি অনুরাগকে প্রকাশ করে। কবি ও সাহিত্যিক এ প্রেমকে প্রকাশ করেছেন বিচিত্রভাবে, তার মধ্যে কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি অন্যতম। তবে স্বদেশপ্রেম সবচেয়ে শক্তিশালী রূপে প্রকাশ পেয়েছে কাব্য ও সংগীতে। বলাবাহুল্য সংগীত মানব চৈতন্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। বাণী, সুরের মূর্চ্ছনায়, তাল, লয়ের ছন্দবদ্ধ ঝঙ্কারে মানবজীবনের গভীরতর অনুভূতির মায়া তৈরি করে সংগীত। মানুষের অনুভূতি আর জীবনের নানা সমীক্ষণে যুগে যুগে সংগীতের নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যদিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সংগীতের বিচিত্র ধারা। যে ধারাগুলোর মধ্য অন্যতম একটি স্বদেশী সংগীত। স্বদেশী সংগীতকে গবেষকগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে স্বদেশীসংগীত, স্বদেশীগীত, স্বদেশী গান, দেশাত্মবোধক গান ও স্বদেশ পর্যায়ের গান নামে উল্লেখ করেছেন। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে স্বদেশী গানের গীতিকারগণ উক্ত পর্যায়ের গানে দেশবন্দনা, পরাধীনতার গ্লানি, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আত্মউদ্দীপনা প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলেন। মূলত পরাধীনতার বোধ থেকেই বাংলা স্বদেশ পর্যায়ের গানের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে। তবে এর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে উনবিংশ শতাব্দির শেষে আর বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সংগীতধারার উন্মেষ ঘটে তাকে মূলত স্বদেশী গান বলে অভিহিত করা হয়। পরাধীন নাগরিকের অন্তর-জ্বালা, পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে বিভোর জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার সাঙ্গেতিক প্রকাশই স্বদেশী গানের মূল ও মৌলিক প্রাণবস্তু। যে কোনো দেশের স্বদেশী সংগীত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঐ দেশের অতীত ইতিহাস-ঐহিত্য, বীরত্মগাথা, স্বদেশের সৌন্দর্য্য, শোষণ, শাসন ও প্রতিবাদের নানা অনুষঙ্গ। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশ চেতনার গান রচনার আধিক্য দেখা গেলেও এই স্বদেশ চেতনা একদিনে সৃষ্টি হয় নি। জীবন-পরাধীনতার আর স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদনের শেষ পরিণতি এই আন্দোলন। এই আন্দোলন পরাধীন মানবচৈতন্যে স্বাধীনতার গভীর স্বপ্নে মগ্ন করে। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভের জন্য সৃষ্ট আন্দোলনই নতুন পথের সন্ধান দেয়। আর আন্দোলনের শেষ পরিণতি ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার সহচর হিসেবে কাজ করে সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সমাজ সংস্কারক আর গীতকবি। গীতকবিদের রচিত সংগীত জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে।

গানগুলোর মধ্যে ছিল বীররসের প্রবল শক্তি। বাণীতে অপার ক্ষমতার ফলে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী হয়ে উঠার সাহসিকতা যুগিয়েছিল। কবিদের হৃদয়মথিত কাব্যগীত হয়ে উঠেছিল হৃদয়াস্ত্র ও প্রেরণার হাতিয়ার। এ অধ্যায়ে স্বদেশ পর্যায়ের গানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনাই আমাদের লক্ষ্যবস্তু।

স্বদেশী গান

সংগীতের মধ্যদিয়ে মানব হৃদয়ে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। আর এই সংগীতের নিজস্বরূপ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গেলে বলা যায় গীত, নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে উপস্থাপিত বিশেষ ক্রিয়া একত্রে নিষ্পন্ন হলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাকে সংগীত বলা হয়। যা মানুষের সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতিময় আবেগ প্রকাশের একপ্রকার বিশেষ ভাষা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সংগীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা' আবার, 'সংগীত আমাদিগকে অব্যবহিত যে সুখ দেয়, তৎসঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষার (Language of the emotions) পরিস্ফুটতা সাধন করিতে থাকে। আবেগের ভাষায় সংগীতের মূল।"[১] বিশ্বসংগীত এলাকায় অবলোকন করলে দেখা যাবে সংগীতের বৈচিত্র্যময় ধারা। যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুভূতি প্রকাশের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক তেমনি দেশ মাতৃকার প্রতি প্রেম আর ভালোবাসার জন্যে যে ধারার উদ্ভব হয়েছে তাকে আমরা স্বদেশী গান বলে আখ্যায়িত করে থাকি; তবে এর নানা বৈচিত্র্যময়তা রয়েছে। স্বদেশী গান বলতে আমরা সাধারণত সেই গানগুলোকেই বুঝি, যে গানগুলোর মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্র বা জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়ে তুলে। সেই সাথে মানবচৈতন্যে দেশাত্মবোধ ও দেশের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জাগ্রত করতে সাহায্য করে। বলাবহুল্য স্বদেশী গান মানুষকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, দেশের মানুষের প্রতি মঙ্গল কামনার মানসিকতা তৈরির পাশাপাশি জাতির সংকটময় মূহুর্তে স্বদেশী গান সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আধুনিককালে স্বদেশী গানকে দেশাত্মবোধক গান বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাই গবেষক করুণাময় গোস্বামী সংক্ষেপে দেশাত্মবোধক গানের সংজ্ঞায় বলেছেন "যে গানে দেশের প্রতি বন্দনা ও অনুরাগ প্রকাশ করা হয় এবং স্বদেশের দুঃখ মোচনে দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয় তারই নাম দেশাত্মবোধক গান"।[২] অর্থাৎ এ গান জনগণকে দেশ ও জাতির প্রতি সচেতনতার পাশাপাশি স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। বলাবহুল্য কোনো দেশের শ্রমজীবী মানুষকে অধিকার সচেতন করা এবং অধিকার আদায়ে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে এ গান রচিত হয়। গবেষকগণ স্বদেশী গানের দুইটি ধারা নির্ণয় করে বলেছেন স্বদেশী গানের বিষয় যখন হয়

দেশ, তখন তাকে বলা হয় দেশত্মাবোধক গান, আবার বিষয় যখন জনগণ হয় তখন তাকে বলা হয় গণসঙ্গীত।

বাংলা সংগীতের ইতিহাস আলোচনায় স্বদেশী গান বা সংগীতের ইতিহাস খুবই নতুন বলে ধারণা করা হয়। বাংলা গানের হাজার বছরের গতি প্রকৃতিতে সংগীতের যে ব্যাপক পবিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তাতে সমাজজীবনের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাচীন চর্যাকারদের কাব্যসংগীত থেকে রামপ্রসাদের গান পর্যন্ত প্রায় সাতশ বছরের গতি প্রকৃতিতে স্বদেশ সম্পর্কিত গীতবাক্যের তেমন কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। তবে আবদুল হাকিম (জন্ম : ১৬২০ - মৃত্যু : ১৬৯০) মধ্যযুগের বিখ্যাত বাঙালি কবি তৎকালীন একশ্রেণির লোকের বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞার জবাবে তিনি তাঁর নূরনামা কাব্যে লিখেছিলেন 'যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'[৩] তবে এখানে ভাষার প্রতি প্রেম থাকলেও সামগ্রিক অর্থে স্বদেশের প্রতি প্রেম বা অনুরাগের উল্লেখ নেই। অপর দিকে এ বিষয়ে সংস্কৃত রামায়নের উক্তি প্রণিধানযোগ্য "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' অনুবাদ "মা (জননী) ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেয়।" কিন্ত এই বাক্যটি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে, কারণ সংস্কৃত ভাষায় Patriotism (দেশপ্রেম) এর কোনো প্রতিশব্দ নেই। উপমহাদেশের স্বদেশপ্রেমের সাহিত্য বিশ্লেষণের দুইটি ধারা- "স্বদেশপ্রেম মানবপ্রীতি প্রকৃতি-প্রীতি বা ঈশ্বরভক্তির মতই একটি ভাব বা ধারণা বা অনুভূতি ; আর একটি স্বদেশপ্রেম বিশেষ কর্মের জন্য মানুষকে উদ্বোধিত বা উত্তেজিত করার অস্ত্র।"[৪] ঐতিহাসিক বিচারে উনিশ শতকের প্রারম্ভে উপমহাদেশের প্রথম স্বদেশী গানের সূচনা করেন যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও তাঁর অনুসারীরা। পরবর্তীতে উক্ত শতকের মধ্যভাগে বিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বদেশী গানে ব্যাপক বিকাশলাভ করে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধকারী শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক গানগুলো রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন প্রমুখ। উল্লেখ্য আমাদের জাতীয় সংগীত'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় রচনা করেন। এই "স্বদেশপ্রেমের কারণ রাজনৈতিকবোধ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর সচেতনতা। আর সেই সচেতনতার প্রত্যক্ষ কারণ ইংরেজিশাসন ও ইংরেজি শিক্ষা" [৫]।

স্বদেশী গানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

স্বদেশী আন্দোলন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক সামাজিক ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তার অবয়ব শিল্প ও সাহিত্যেও গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিল্পী ও সাহিত্যিক হয়েছেন ব্যাপক আলোচিত ও সমালোচিত। ফলে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট শিল্প জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কোনো রাষ্ট্রের শিল্প-সাহিত্য ঐ রাষ্ট্রের জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্রে বসবাস করে। অনুরূপভাবে ভারতবর্ষের জন্মলগ্ন থেকে বৃটিশ শাসনকালে নানা রাজনৈতিক দ্বান্দ্বিকতার সাথে মিলিত হয়ে আসছে। স্বদেশ চেতনার গান রচনার আধিক্য বৃটিশ শাসনকালের শেষ শতাব্দীতে দেখা গেলেও এই স্বদেশ চেতনা একদিনে সৃষ্টি হয় নি। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা মানুষের জন্মগত হলেও বিস্তৃত আকারে স্বদেশী গান রচনা মূলত ভারতবাসীকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে রচিত হয়। বৃটিশ শোষণ এবং মানুষের উপর নির্যাতন ভারতবাসীকে স্বাধীনতার পথে হাঁটতে শেখায়। পরাধীনতার গ্লানিই ভারতের রাজনৈতিক চেতনা পুষ্ট করেছে- শিখিয়েছে প্রতিবাদের ভাষা। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ নিজেদের মতো করে নিজেদের দেশ পরিচালনার উদ্দেশ্যেই পুরো ভারতে স্বদেশী চেতনা দানা বাঁধে রাজনৈতিক চেতনার নামের ভেতর দিয়ে। এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্বদেশ চেতনার গানের সঙ্গে রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক চেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ইংরেজ শাসনের প্রভাব ভারতবর্ষে এমনকি বাংলায় কীভাবে মানুষের মনে আঘাত করেছে আর সেই প্রেক্ষাপটে কীভাবেই বা নানা আন্দোলন ভারতবর্ষের মানুষকে মুক্তির পথে হাঁটতে শিখিয়েছে তার আলোচনা স্বদেশী গান রচনার ইতিহাসকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলবে।

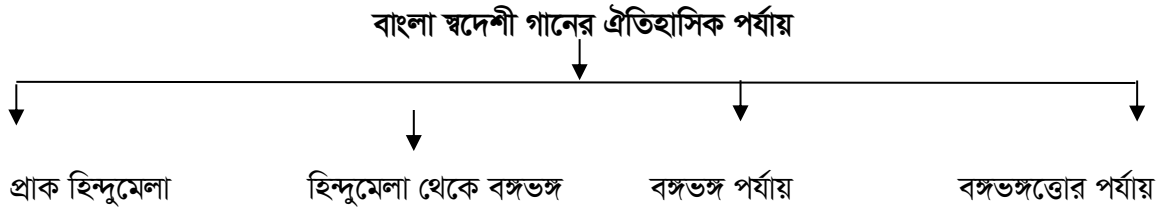

প্রাক হিন্দুমেলা (আদি থেকে ১৮৬৭)

ইংরেজ শোষণের ফলস্বরূপ জাতীয়তা বোধ থেকে স্বদেশী আন্দোলন তথা স্বদেশী গানের উদ্ভব। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে ইংরেজ শোষণ এবং ভারতের স্বাধীনতার পথযাত্রার ইতিহাসই আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে। ভারতবর্ষের যে কয়টি অঞ্চলে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন এবং প্রতিরোধ তুঙ্গে ওঠে তার মধ্যে বাংলা অন্যতম। বাংলায় ব্রিটিশ কোম্পানি তাদের কার্যক্রম শুরু করে ১৬৯০ সালে, এই কোম্পানি নবাবী আমল শেষ হবার পর কলকাতা থেকে শোষণ পরিচালিত করে । ১৭৭২ সাল থেকে কলকাতায় অবিভক্ত ভারতের রাজধানী স্থাপনের পর থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে কলকাতা নগরী কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তবে এর মূল উদ্দেশ্যে ছিল মুনাফা অর্জন করে নিয়ে যাওয়া। একের পর এক তাদের স্বার্থ রক্ষার আইন প্রণয়ন করে এবং ভারতীয়দের নূন্যতম সুযোগ-সুবিধার কথা না ভেবে তারা তাদের শক্তি দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতো। ফলে ভারতীয়রা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নানা অঞ্চলে শুরু করে একের পর এক বিদ্রোহ। কিন্তু ইংরেজরা বিদ্রোহী বিপ্লবীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আরও কঠোর থেকে কঠোরতর আইন প্রণয়ন করেও এইসব বিদ্রোহ দমাতে পারে না। এদের মধ্যে কমলনাথ তিওয়ারি, অরুনা আসদ আলি, অরবিন্দ ঘোষ, চন্দ্রশেখর, আজাদ, অ্যানি বেসান্ত, ক্ষুদিরাম বসু, বিনায়ক দামোদর সাভারকর, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্র নাথ দাস, গান্ধীজী, হাকিম আজমল খাঁ, জওহরলাল নেহ্রু, নালা নাজপত রায়, রামমোহন রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, স্বামী বিবেকানন্দ এরূপ অনেকেই নানাভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেন। তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শীসহ নানা সংগ্রামের ডাক দেন। যদিও ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের উদারনীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিল 'The Charter Act of 1813' এর কিন্তু বাস্তব ছিলো পুরোটাই ভিন্ন। এ আইনে বলা হয় 'it is the duty of this country to promote the interest and happiness of the native inhabitants of the British dominions in India'[৬] আইনে বিধান যেটাই থাকুক ভারতের জনগণের উপর যে অত্যাচার কোম্পানী চালায় তার ফলাফল হিসেবে ১৮৫৭ সালে ঘটে সিপাহী বিদ্রোহ যা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের ফলস্বরূপ ২ আগস্ট ১৮৫৮ সালে কোম্পানির কাছ থেকে ভারতের শাসনভার কেড়ে নিয়ে ন্যাস্ত হয় ইংল্যান্ডের রাণীর হাতে। কিন্তু ১৮৬৬-১৮৭৬ সালে দুর্ভিক্ষের সময় ইংরেজ সরকারের ঔদাসীন্য এবং অসংখ্য ভারতবাসীর মৃত্যু ভারতের জনগণকে আবারও সোচ্চার হতে শেখালো। এই আন্দোলন উত্থান পতনে মধ্যে চলতে থাকে, যা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৭৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন তাঁর স্বদেশপ্রেমের অনন্য কীর্তি-

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সফলাং মলয়জশীতলাম্।

শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্।

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্।

সুখদাং বরদাং মাতরম্...[৭]

এই গানটি রচনার বছর ছয় পর লেখক সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নিয়ে রচনা করেন 'আনন্দমঠ' উপন্যাস। বাঙালির জাতীয় জীবনগঠন ও দেশের যুবসম্প্রদায়কে স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণে ত্যাগ ও সেবাধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আনন্দমঠ উপন্যাসের সন্তানদলের সৈন্যাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী ভবানন্দের কণ্ঠে এটি বসান। এ বিষয়ে পাঁচুগোপাল বক্সির মন্তব্য স্মরণযোগ্য:

> 'এ-তো নিছক গান নয়; স্বদেশস্তোত্র; বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, দেশপ্রেমিকদের নিয়ত উচ্চারিত পবিত্র মাতৃমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত মুক্তিসেনারা ভবানন্দের মতো বলেন, 'আমরা অন্য মা মানি না–জননী, জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপিগরিয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই– স্ত্রী নাই,পুত্র নাই,ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়জ সমীর শীতলা শস্যশ্যামলা–' তাঁরা এই মন্ত্র জপ করে হাসতে হাসতে নির্যাতন ভোগ করেন, ফাঁসি কাঠের দড়িকে ফুলের মালার মতো বরণ করেন।[৮]

সিপাহী বিদ্রোহ ইতিহাসে বড় একটি বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত হলেও ছোট-বড় সকল বিদ্রোহের গুরুত্বই ছিল অপরিসীম। ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুরুলিয়ার পঞ্চকোটের রাজার নেতৃত্বে নিষাদ ভূমিজদের সর্দার ঘাটোয়ালদের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৯), মেদিনীপুরের ডামপাড়ার ভূমিজ সর্দার ঘাটোয়াল বৈজনাথের নেতৃত্বে দশ বছরব্যাপী গণঅভ্যুত্থান (১৮০০-১৮১০), ছোটোনাগপুর পালামৌ অঞ্চলে কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩৩), বরাভূমের সিংহাসনের (১৮৩২-৩৩), বারাসাতে তিতুমীরের নেতৃত্বে গণবিদ্রোহ (১৮৩১) ফরিদপুর দুদু মীরের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থান (১৮৪৭), করলে মোপনা বিদ্রোহ (১৮৪৯, ১৮৫১-৫২, ১৮৫৫), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭), ইত্যাদি লড়াই সংগ্রামের মধ্যদিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা পরাধীন ভারতের স্বাধীনতাগামী পদযাত্রাকে তরান্বিত করে। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন

স্থানে বিদ্রোহ এবং জাগরণ ঘটে তার শুরু বাংলা থেকেই। বাংলাতে নানা সমিতি, সংঘ, পত্রিকা এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে জেগে উঠতে থাকে সাধারণ মানুষ এবং তরুণ সমাজ। এ প্রসঙ্গে পাঁচুগোপাল বক্সি বলেন-

> "ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের যাত্রী বাংলা। সশস্ত্র বিপ্লবের আঁতুড় ঘরও বাংলা। বাংলায় বা বাঙালি বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা সংক্ষেপে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বাঘা যতীনের নেতৃত্বে রোমাঞ্চকর অসম সংগ্রামের উল্লেখ করতে হয়। যশোরের বিসখালির সন্তান যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক আদর্শে উব্বুদ্ধ হন এবং বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করে সশব্দ বৈপ্লবের পরিকল্পনা করেন।"[৯]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুসহ অসংখ্য জ্ঞানতাপস ব্রিটিশ বৈষম্যের প্রতিবাদ করেন। সুরেন্দ্রনাথ আয়োজন করেন Indian National Conference অপরদিকে শিবনাথ শাস্ত্রী বাংলায় গঠন করেন 'স্বাধীনতার সঠিক দল' নামে গুপ্ত সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্যরা অস্ত্র চালনা, ঘোড়ায় চড়া সহ বিভিন্ন শারীরিক ব্যায়াম ও নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন বাঙালিদের মধ্যে এতোটাই কাম্য হয়ে ওঠে যে, এভাবেই বাংলায় নানা প্রতিবাদের আয়োজনে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ এক হতে থাকে এবং একের পর এক আক্রমন চালাতে থাকে। এ অবস্থায় বাংলার সচেতন মানবসমাজ নানাভাবেই স্বদেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যায়। সাহিত্য-প্রবন্ধ-বক্তৃতা-সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমেও মানুষের মনে স্বদেশ চেতনার বীজ বপনের কাজ চলে। সাংস্কৃতিক নানা আন্দোলন শুরু হয়। সাংস্কৃতিক নানা আন্দোলন সাধারণ মানুষর জাগরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। সাংস্কৃতিক জাগরণে সাহিত্য রচনা এবং সংগীতের ভেতর দিয়ে বাঙালিকে জাগানোর কাজে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। "এই পরিবারের কৃতী সন্তানগণ আলস্য অদৃষ্টবাদ ও হীনম্মন্যতাকে প্রশ্রয় দিয়ে অভ্যাসের জগতে বন্দি থাকতে বা গতানুগতিক জীবনস্রোতে গা ভাসাতে চাননি। তাঁরা কল্যাণকর পরিবর্তনে বা দেশ ও দশের পক্ষে হিতকর নতুন কিছু প্রবর্তনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।"[১০]

তাদের বোধ ও বোধির গভীরতা ছিল প্রশংসনীয় কেননা সমসাময়িক নানা বিষয় তাদের জানা ছিলো। পরিবারের সকলেই আপন প্রতিভা, মৌলিক চিন্তা ও অনিঃশেষ উদ্যমে তাঁরা নিজের নিজের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করায় তৎপর ছিলো। তাঁরা জমিদার পরিবারে হয়েও অন্য দশটা জমিদার পরিবারের মতো ছিলো না। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় তাঁরা ছিলো বাঙালির আদর্শ। ইংরেজি শিক্ষার ভালোটুকু যেমন তাঁদের চর্চায় ছিলো তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির আদ্যোপান্ত তাঁরা নিজেদের আচারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং দেশভাবনা তাঁদের কর্মকাণ্ডে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নানাভাবেই। উল্লেখ্য 'সঞ্জীবনী সভা'

ঠাকুর পরিবার কেন্দ্রিক একটি সংগঠন যা গুপ্ত সমিতি হিসেবে ইংরেজি শাসন বিরোধী অবস্থানে কাজ করেছে। সঞ্জীবনী সভার মাধ্যমে যে সকল প্রয়াস চালানো হয় সেসব মহৎ উদ্দেশ্য যুবক ও তরুণদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা বাড়িয়ে দেয়। সঞ্জীবনী সভার মতোই ঠাকুর পরিবারের প্রচেষ্টা এবং সম্পৃক্ততায় শুরু হয় হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলা।

হিন্দুমেলা (১৮৬৭ থেকে ১৯০৫)

উনিশ শতকে বাংলায় যে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছে অথবা যেসব সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে ছিল হিন্দুমেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। পণ্ডিত রাজনারায়ণ বসুর অনুপ্রেরণা ও পৃষ্টপোষকতায় নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে চৈত্রসংক্রান্তির দিন কলকাতায় 'হিন্দুমেলা'-র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পথ সৃষ্টি করেন।

> "এজন্য সংগঠনটি 'চৈত্রমেলা' নামেও পরিচিত ছিল। হিন্দু মেলার প্রথম সম্পাদক ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন নবগোপাল মিত্র । হিন্দুমেলার সদস্যদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রমানাথ ঠাকুর, পিয়ারি চরণ সরকার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্টদাস পাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ" [১১]

মূলত বাংলায় স্বদেশী গানের যুগ এ সময় থেকেই শুরু হয়। ইংরেজ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে ভারত জুড়ে যে চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং এর ফলে সর্বভারতে যেভাবে শতাব্দী জুড়ে আন্দোলন দানা বাঁধে তার সাঙ্গেতিক প্রকাশ বাংলায় বিস্তৃতভাবে শুরু হয় 'হিন্দুমেলা' কে কেন্দ্র করে। বাংলায় স্বদেশী সংগীতের বা স্বদেশ পর্যায়ের যে সকল গান রচনা হয়েছে তা এই অধ্যায়ে আলোচিত ইংরেজবিরোধী নানা ঘটনার ফলস্বরূপই হয়েছে। মানুষের ক্ষোভ নবরূপে স্বদেশ পর্যায়ের গানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। হিন্দুমেলায় যে স্বদেশ চেতনা প্রকাশ পেয়েছিল তা অনেকটাই বিদেশীদের অনুকরণে দেশপ্রেম। হিন্দুমেলার মূল উদ্দেশ্যকে মূলত ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় -

১. এই মেলাভূক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারা হিন্দুজাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্য সকল সংসাধন জন্য একদল অভিভূক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগন মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাবে উন্মিলন্ করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্য্যে নিয়োগ করতঃ এই মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।
২. প্রত্যেক বৎসরের আমাদিগকে হিন্দু সমাজে কতটা দূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য চৈত্রসংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।
৩. অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।
৪. প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

৫. প্রতি মেলায় স্বদেশীয় সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তিগনের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।
৬. যাঁহারা মল্ল-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিক করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশী লোকের মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা পরিচালিত করিতে হইবে।[১২]

আর এই ছয়টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গদের বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তবে যাই হোক না কেন হিন্দুমেলার পৃষ্টপোষকদের অন্যতম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য

> "দেখ একরকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল' কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ন বাবুই বল তাহাদের Patriotism এর বার আনা বিলাতি, চার আনা বেশি। ইংরাজ যেমন Patriot, আমিও সেই রকম Patriot হব- এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মতো Patriot হইবো কেন? আমি আমার মতো Patriot হইতে না পারিলে কি হইল। নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি, জিমন্যাষ্টিক, প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিলো; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল,– তাঁতি, কামার, কুমার ইত্যাদি লইয়া।"[১৩]

মেলার প্রথম অধিবেশন হয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র-সংক্রান্তিতে (১৮৬৭ সাল)। মেলার বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাল্যকথা'য় লিখেছেন' "আমি বোম্বাইয়ে কার্য্যারম্ভ করার কিছু পরে কলিকাতায় এক স্বদেশী মেলা প্রবর্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন। ....কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চারি দিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিষের প্রদর্শনী, জাতীয় সংগীতবক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা হত।"[১৪] ১৮৬৮ সালে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটি গীত হয়। 'হিন্দুমেলা'র মাধ্যমে জাতীয় সংগীত বা দেশাত্মবোধক গান সৃষ্টির যে যুগ শুরু হয় 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনে তা তুঙ্গে ওঠে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই ভারতবাসীকে আন্দোলন প্রতিরোধের দিকে হাঁটতে শেখায় আর তার ধারাবাহিক কর্ম-প্রবাহে মানুষকে উদ্দীপ্ত করতেই রচিত হয় স্বদেশ সম্পর্কিত গান।

বঙ্গভঙ্গ পর্যায় (১৯০৫ থেকে ১৯১১)

বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে যে আন্দোলন হয়েছিল তাই ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত। যা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বিবেচিত। বিলেতি দ্রব্য বর্জন ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু। যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য স্বদেশীকতা অর্থাৎ স্বদেশী দ্রব্য বা বস্তু গ্রহণ- তাই এই আন্দোলনকে স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। বিদেশী পণ্য বর্জনের পাশাপশি বিদেশী বিচারালয়, বিদেশী

শিক্ষা ও বিদেশী শাসন ব্যবস্থাও বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে পূর্বালোচিত হিন্দুমেলার মাধ্যমে যে আন্দোলনের মূল বীজ অঙ্কুরোদগম হয়, তা বঙ্গভঙ্গে এসে পূর্ণতা লাভ করে। কেননা হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে আন্দোলন সূচিত হয় তার প্রমান পাওয়া যায় উক্ত সময়ে সৃষ্ট দেশাত্মবোধক গান থেকেই। এই সম্পর্কে গীতা চট্টোপাধ্যায় এর বাংলা স্বদেশী গান গ্রন্থের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> হিন্দুমেলা ছিল মূলত শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির স্বদেশ অনুভূতির প্রকাশ এর প্রথম প্রয়াস একে কেন্দ্র করে কলকাতা শিক্ষিত তরুণরা স্বদেশ চেতনা জাতীয় ভাবনা প্রকাশ পেয়েছিল ভারত বর্ষ সম্পর্কে নবজাগ্রত এক শ্রদ্ধাবোধ দেশ প্রেমিকদের দেশের অস্তিত্ব দেশের অবস্থা তার অতীত ও বর্তমান দৈন্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল ভারত মাতার মলিন হয়েছে কখনো বাধা কাটিয়ে উঠে ভারতে মুখরিত হয়েছে কিন্তু এই স্বদেশ প্রেম ভাব কাটিয়ে আন্দোলন রূপে চিহ্নিত করতে পারেনি কিন্তু বঙ্গভঙ্গকে অবলম্বন করে স্বদেশপ্রীতি নিছক ভানুবতির সংকীর্ণ পরিমণ্ডল ছাপিয়ে কর্মে রূপায়িত হয় এ ধারণা অনুসারে অসহযোগ আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন রূপ লাভ করে জাতীয় আন্দোলনের সম্পৃক্ততা লাভ করল। [১৫]

এই আন্দোলনের বিরাট অংশে ছিল জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করার পাশাপশি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলা। এই যাত্রাপথে সবচেয়ে বেশি শক্তি ও মনোবল যুগিয়েছে স্বদেশী গানগুলো। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে গান রচিত হয়েছে তা বাংলা গানের ইতিহাসে বিরল। মূলত সে গানগুলোর মূখ্য রচয়িতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন, মুকুন্দ্র দাস, রাজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সরলা দেবী চৌধুরানী, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অমৃতলাল বসু , প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী, বিজয় চন্দ্র মজুমদার, কামিনী কুমার ভট্টাচার্য, মোহন চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিগণ। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প সময়ে বেশকিছু গান রচনা করে ফেলেন। যে গানগুলো মূলত স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই রচনা করা। গানগুলোতে স্বদেশ প্রেমের মহিমাই উদ্ভাসিত হয়েছে; এতে স্বদেশী আন্দোলনের রূপ প্রতিফলিত হয় নি। এই প্রেক্ষিতে সুভাষ চৌধুরীর মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য:

> সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হলেও গীত রচনা তা কখনো প্রাধান্য পায়নি। আত্মশক্তি বিকাশ যে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়েছে এইসব গানে অভূতপূর্ব । দেশবন্ধনা বিচিত্র রূপ পূর্ববর্তী গীকিারের রচনায় পাওয়া যায়নি। কোনটিতে বাংলামায়ের শ্যামল কোমল রূপ বর্ণিত, কোনটিতে বঙ্গভঙ্গ রোধ করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা, কোনটিতে বজ্যনির্ঘোষ কণ্ঠে শাসন হুঁশিয়ারী জ্ঞাপন। বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন গীতেকারের দু-একটি গানের এই চেতনার রূপবিকাশ দেখা গেলো রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের গান গুলিতে যেন সম্পর্ন স্বতন্ত্র এক ধারার সৃষ্টি হল।[১৬]

কেননা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের কাব্যগুণ বাণীর সৌন্দর্য্যের দিক থেকে অনন্য উচ্চতায় চলে যায়। শুধু তাই নয় বিচিত্র সুরের যে সাবলীল প্রয়োগশৈলী তিনি ঘটিয়েছেন তা তাঁর সৃষ্টিভাণ্ডারকে অমরতা দান করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গানগুলোর অধিকাংশ সুরেই মূলত লোকসুরের ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। যার মাঝে বাউল, কীর্তন, সারি অন্যতম। তিনি এই আন্দোলনকে গতিশীল ও উজ্জীবিত করার জন্য মোট ২৩ টি মতান্তরে ২৭টি গান রচনা করেন। গানগুলো হলো :

১. আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

২. আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥

৩. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!

৪. আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে॥

৫. আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে॥

৬. ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥

৭. ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি,
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী॥

৮. ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।

৯. ও জোনাকী কি সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ
আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ॥

১০. এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী॥

ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে, ভাই, ডাক দে আজি

১১. ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে ওরে ভাই,
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস নে ওরে ভাই॥

১২. ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক্-না ওরে, বক্ষোদুয়ার আঁটি

১৩. নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।

১৪. বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই!
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষী ঠেলিস নে ভাই॥

১৫. বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান-
তুমি কি এমনি শক্তিমান!

১৬. বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান

১৭. তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।

১৮. মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে॥

১৯. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে॥

২০. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ॥

২১. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!

আমি তোমার চরণ--

মা গো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা ॥

২২.যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু॥

২৩.যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না।

যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা॥

তবে এই আন্দোলনের অন্যতম আরেক লক্ষ্য ছিল হিন্দু- মুসলমানের ঐক্যের মাধ্যমে সম্প্রীতি গড়ে তোলা। তাই রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট ও সুদৃঢ় করার জন্য পরিকল্পনা করেন রাখীবন্ধন উৎসব আয়োজনের। এই উৎসব বাঙালিদের কাছে কেবলই ভাই-বোনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে ধর্মীয় ও সামাজিক গণ্ডি পেরিয়ে রাখিকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জায়গা দিয়েছে। এই রাখীবন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গান রচনা করেন তার মধ্যে "বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৫-১৯১০) এর সক্রিয় উপস্থাপন ছিল অনবদ্য। কেননা তাঁর রচিত গান ভাববৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। ফলে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠতে তাঁর সময় লাগে নি। তাঁর রচিত গানগুলোর মধ্য "বঙ্গ আমার জননী আমার! ধাত্রী আমার আমার দেশ" ও "ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে গানগুলো তৎকালীন ভারতীয় জনগণের হৃদয়ের মণিকোঠায় বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছিলো। অপরদিকে বাংলা গানের নতুন দিক উন্মোচিত করেছিলো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বেশকিছু ব্যঙ্গ সংগীত রচনা করেন। যে গানগুলি মানুষের মনে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। সেই হাসির গানগুলো তৎকালীন বাঙালি সমাজে একটা ভাববিপ্লব ঘটিয়েছিলো। গানগুলোর অসাধারণ হয়ে ওঠার মূল রহস্য "দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের বহু উপকরণই স্থূল, কিন্তু সেই দৈনন্দিন জীবনের স্থূল উপকরণ গুলিকেই তিনি উন্নত শিল্পমর্যাদা দিয়েছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। হাসির গান বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সৃষ্টি"[১৭] তাঁর সুরশৈলী ও সংগীতে অসাধারণ অবদানের বর্ণনা করতে গিয়ে দিলিপকুমার রায় বলেছেন "শিল্পের ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টিকে বুঝতে হলে স্থান-কাল পরিবেশের পটভূমিকে বাদ দেওয়া চলে না। অন্যদিকে জনপ্রিয়তাকে একমাত্র মানদণ্ড বলে ধরে নেয়া

সমীচীন নয়, রচনার বাহুল্যতাকেও নয়। সব দিক বিচার করে দেখলে পরে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমাদের দেশের সুরকারদের একজন শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ বলে স্বীকার করতে হয়।" [১৮] উল্লেখ্য পরবর্তিতে কাজী নজরুল ইসলাম সহ রজনীকান্ত সেন স্বদেশী ব্যঙ্গ সংগীতের ধারায় বেশকিছু গান রচনা করেন।

স্বদেশী সংগীতের অন্যতম মহান পুরুষ রজনীকান্ত সেন ছিলেন সফল সংগীত রচয়িতা। তাঁর অসাধারণ ভক্তিসংগীত ও স্বদেশী উদ্দীপনামূলক গানের জন্য তিনি বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেন। রজনীকান্ত সেনের সংগীতধারা বিশ্লেষণ করলে তাঁর সংগীত রচনাকে মূলত ৩টি (ভক্তিমূলক গান, স্বদেশী গান, হাসির গান) ধারায় ভাগ করা যায়। তাঁর রচিত স্বদেশী সংগীতগুলি কালোত্তীর্ণ মর্যাদা অর্জন করেছিলো। সমসাময়িক জনপ্রিয় অনেকের গানের মতোই রজনীকান্ত সেনের গান তৎকালীন স্বাধীনচেতা মানুষের মনে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো।

তাঁর রচিত "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই/ দীন-দুখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই" গানটি তৎকালীন সময় আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি অমর সংগীত। যে গানটি সম্পর্কে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন "১৩১২ সালে ভাদ্র মাসে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ঘোষণার কয়েকদিন পরে কর্নওয়ালিশ স্টীট ধরিয়া কতকগুলো যুবক নগ্নপদে "মায়ের দেয়া মোটা কাপড়" গান গাহিয়ে যাইতেছিল। এখনো মনে আছে গান শুনিয়া আমার রোমাঞ্চের উপস্থিতি"[১৯]

আমরা নেহাত গরীব, আমরা নেহাত ছোট,- তবু আছি সাতকোটি ভাই,-জেগে ওঠ!, আর কিসের শঙ্কা, কেমন বিচার কচ্ছে গোরা, ছোটে ভাই হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতুলপ্রসাদ সেন রবীন্দ্র যুগে জন্ম নিলেও তাঁর রচিত গানে বাণী ও সুরসৌন্দর্য্যে ছিল স্বতন্ত্র। কেননা তাঁর সংগীতজীবন গড়ে উঠেছিল ঠুংরী ও গজলের আবহওয়াতে। আর ব্যক্তি জীবনে রাজনৈতিক দর্শনে তিনি ছিলেন গোখলেপন্থী আর তাই "১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ সুদূর লক্ষ্ণৌয়ে অতুলপ্রসাদের চেতনাকে আঘাত হেনেছিল। দেশব্যাপী জনজাগরণ ও গনআন্দোলনে তিনি উৎসাহিত বোধ করেন। ছুটে আসেন বাংলাদেশে। তাঁরই রচিত স্বদেশী-সংগীত তখন বাঙালীর মুখে মুখে ফিরছে"[২০] স্বদেশী আন্দোলনের অল্পসংখ্যক গান লিখে যে অমর হয়ে আছেন অতুলপ্রসাদ সেন। তাঁর গানে উদ্ভাসিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক ঐক্য, দেশপ্রেম, মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমতা। এছাড়া স্বদেশের ভবিষ্যতের ছবি তাঁর গানে ফুটে উঠেছিলো। অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)এর গানগুলো বাংলা স্বদেশী সংগীতের জন্য সুন্দর স্বার্থক সংযোজন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গান, "মোদের গরব মোদের আশা/ আ মরি! বাংলা ভাষা" যা বাংলা গানের সর্বাধিক গীত একটি গান। সাম্প্রদায়িক

মিলনের আহ্বানে তিনি রচনা করেছেন; পরের শিকল ভাঙিস পরে/ নিজের নিগড় ভাঙরে ভাই। অতুলপ্রসাদ সেনের অমর রচনার মধ্য অন্যতম "ওঠো গো ভারত লক্ষ্মী","বলো বলো বলো সবে" বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাঁর সৃষ্ট গানে বিভিন্ন সুরের মিশ্রন লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসংঙ্গে সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত প্রণিধানযোগ্য "বাংলাদেশের বাউল ও কীর্তনের মাধুর্যেও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিভিন্ন সুর প্রয়োগে তিনি এক বিশিষ্ট সংগীত রীতির প্রবর্তন করেন। মার্গসংগীতের পরিবেশের মধ্যে থাকলেও এ সম্পর্কে কোন 'পিছুটান' না থাকায় সুরমিশ্রণে তাঁর কোন দ্বিধা ছিলা না।"[২১] এছাড়া তৎকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় রামপ্রসাদী সুরে তিনি রচনা করেছিলেন 'দেখ মা এবার দুয়ার খুলে/ গলে গলে এনু মা তোর...গানটি।

স্বদেশী গানের অমর স্রষ্টা মুকুন্দ দাস (ফেব্রুয়ারি ২২, ১৮৮৭ - মে ১৮, ১৯৩৪) তাঁর সৃষ্টিশৈলী ও সৃজশীলতার জন্য বাঙালি কবি সমাজ তাঁকে চারণ কবির সম্মানে ভূষিত করে। তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেক স্বদেশী গান রচনার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন। মুকুন্দ দাস ব্রিটিশ শাসকদের জানিয়ে দিয়েছিলন-আর কি দেখাও ভয়! দেহ তোমার অধীন বটে মন তো স্বাধীন রয়। হাত বাঁধবে পা বাঁধবে, ধরে না হয় জেলে দেবে, মন কি ফিরাতে পারবে এমন শক্তিময়? তিনি তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও গণসংগীত গেয়ে জনগণের মোহনিদ্রা ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তাঁর জন্ম মূলত বর্তমান বরিশালে আর ভৌগোলিক কারণে বরিশাল ছিলো স্বদেশী আন্দোলনের জন্য উত্তাল কেন্দ্র; ফলে তার রচিত গান স্বদেশী যুগে সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুকুন্দ দাসের সৃষ্টিশৈলী সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা সংগীত ইতিহাসে যেমন নজরুল তাঁর বিদ্রোহী সত্ত্বায় ভাস্বর ঠিক তেমনি মুকুন্দ দাসও চারণ কবি হিসেবে সর্বাধিক খ্যাত। স্বদেশী আন্দোলনে তাঁর গান বাঙালী স্বাধীনতাপন্থি মানুষদের ব্যাপক সাহস জুগিয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গানগুলির মধ্যে "মায়ের নামে বাদাম উঠিয়ে দেরে", "ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে / মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে", "মায়ের নাম দিয়ে ভাসা তরী"। তিনি শুধু গীত রচনায় পটু ছিলেন না- হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচিত, "ছেড়ে দাও কাচের চুড়ী রঙ্গনারী, কভু হাতে আর পরো না" গানটির গায়ক হিসেবেও খ্যতি লাভ করেন। অপরদিকে কাব্যবিশারদ কালীপ্রসন্ন (১৮৬১-১৯০৭) স্বদেশী আন্দোলেনে তাঁর সৃষ্ট সংগীত দিয়ে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। অনেক আগে থেকে তিনি স্বদেশী সংগীত রচনায় ব্রতি হলেও বঙ্গভঙ্গের পর তাঁর রচিত সংগীত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষ করে "মাগো যায় যে জীবন চলে/ শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে/ বন্দেমাতরম্ বলে" গানটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তাঁর গানের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দুস্থানি রাগের প্রয়োগশৈলীর সাথে বঙ্গদেশের খেটে খাওয়া মানুষের সুরের বহুমাত্রিক ব্যবহার। যেমন কীর্তন সুরের গানটি; "এক দেশে থাকি

এক মাকে ডাকি/ এক সুখে সুখী ছিলাম সবে"। গানটি ছিল সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর রচিত। তাড়াছা স্বদেশী গানের ঐতিহাসিক দিক বিচারে দেশব্রতী অশ্বিনীকুমার দত্তের অবদান অবিস্মরণীয়। স্বদেশী গানের সৃষ্টিভাণ্ডারে গচ্ছিত আছে তাঁর বেশকিছু অমর সংগীত। যেমন "আয় রে আয় ভারতবাসী আয় সবে মিলে/ আয় আয় সবে ভাই যাই দ্বারে দ্বারে", "বিধি কি নিদ্রিত আজি মনে কর বিদেশিগণ" প্রভৃতি গান রচনা সহ আন্দোলনের জন্য বরিশাল অঞ্চলে তিনি জাতীয় নেতার স্থানলাভ করেন। অপরদিকে মনমোহন চক্রবর্তীর, "চল্ রে চল্ রে চল রে ও ভাই/ জীবন-আহবে চল. চল চল চল" গানটি স্বদেশী আন্দোলনে দেশাত্মবোধক গানের ধারায় লোকপ্রিয়তা অর্জন করে। এছাড়াও প্রমথ নাথ রায় চৌধুরীর রচিত "নম বঙ্গভূমি জননী লোকালিনী" গানটি এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদারের (১৮৬১-১৯৪২) রচিত "জাগো জাগো ভারতমাতা" গানগুলো ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যে কয়জন নারী আন্দোলকারীর নাম সোনার অক্ষরে লেখা আছে তার মধ্যে অন্যতম কামিনী রায় (১৮৬৪ -১৯৩৩)। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের মহিলা স্নাতক ডিগ্রীধারী ব্যক্তিত্ব যিনি আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত "তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন, শুনে যা আমার আশার কথা" ও "আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে/ তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা" বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম মহিলা গীতিকার সরলাদেবী চৌধুরানী যাঁর জন্ম বিখ্যাত জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। ব্যক্তিগত জীবনে বাবা জানকীনাথ ঘোষালের এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা ছিলেন। উল্লেখ্য ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি রচনা করেন "বালাই নিয়ে মরি তোদের আর ধরমের ভাই", "মন্ত্রস্তব্ধ জড় কণ্ঠরুদ্ধ", "বন্দি তোমার ভারত জননী/ বিদ্যামুকুট ধারিণী/ অতীত গৌরববাহিনী মম বাণি"! গাহ আজি হিন্দুস্থান ছাড়াও সরলাদেবীর "রণাঙ্গিনী নাচে" গানগুলো বিশেষ স্থান দখন করে আছে। বলাবাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বিখ্যাত "বন্দেমাতরম' গানের সুরকার হিসেবে তিনি ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন।

হিন্দুমেলা থেকে শুরু করে স্বদেশী আন্দোলনের সুদীর্ঘ সময়ে বাংলা গানের ইতিহাসে প্রচুর সংগীত রচিত হয় যা বাংলা সংগীত ইতিহাসে বিরল। উক্ত সময়ে বাংলা সংগীত গগনে গীতিকবিদের অবির্ভাব ও তাঁদের সৃষ্টি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গত্তোর পর্যায় (১৯১১ থেকে ১৯৪৭)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতবর্ষের অন্যতম শক্তিশালী আন্দোলন, উক্ত আন্দোলন ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে আন্দোলনত্তোর পর্যায়ে ভারতবর্ষে দেশাত্মবোধক গান রচনা ও পরিবেশনা অনেকটা ধীর হয়ে আসে। বঙ্গভঙ্গত্তোর হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে স্বীকার করা হয়। উক্ত আন্দোলন ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক ও জাতীয় ভিত্তিক গণআন্দোলন। যে আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেয় ও ভারতের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। কিন্তু উক্ত আন্দোলনগুলিকে কেন্দ্র করে সংগীত বা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে মুকুন্দ দাস ছাড়া অপর কোনো প্রধান বাঙালি কবি বা সাহিত্যিক সক্রিয়ভাবে নিবিষ্ট রাখেন নি অথবা আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত বলেন-

> স্বদেশি সংগীতের মুখ্য রচয়িতাদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ১৯০৭ সালে, রজনীকান্ত সেন ১৯১০ সালে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ পরলোকগমন করেন। অতুলপ্রসাদ সেন স্বদেশি গীত রচনার ধারা ত্যাগ করে ভিন্নতর সংগীত সৃজনে নিয়োজিত, স্বদেশি আন্দোলনের প্রধান সংগীত রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশাত্মবোধক গান রচনার ধারা প্রায় ত্যাগ করেছেন। দেশাত্মবাধক গীত রচনায় তিনি আর প্রেরণাবোধ করছেন না তেমন।[২২]

তার প্রধান কারণ হতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে অসহযোগের ধারণাকে সমর্থনযোগ্য মনে হয় নি। ফলে তিনি ঐ সময়ে বর্ষামঙ্গলের জন্য গান রচনা ও তার মহড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঐতিহাসিক বিচারে বঙ্গভঙ্গত্তোর বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র আয়োজনে দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটলেও বাংলা দেশাত্মবোধক সংগীত রচনায় গভীর শূন্যতা থেকেই যায়। তাই বলা যায় বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের গতিবিধির ঐতিহাসিক ধারার সাথে মুকুন্দ দাসই সক্রিয় রইলেন। তিনি তাঁর স্বদেশী যাত্রায় অসহযোগের প্রেরণাকে আপন মনোমত প্রচার করে বেড়াতে থাকলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার রাজদ্রোহের অপরাধে মুকুন্দ দাসকে গ্রেপ্তার করেন এবং বিচারে তাঁকে দিল্লী জেলে আড়াই বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। তাঁর বেশকিছু সৃষ্টি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। উল্লেখ্য তাঁর কর্মের জন্যে "কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণ-সম্রাট মুকুন্দ উপাধিতে ভূষিত করেন"।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যখন সূচনা তখন থেকেই ইংরেজ বিরোধী আর একটি রক্তক্ষরা আন্দোলন শুরু হয়। যার নাম ছিলো সশস্ত্র বিপ্লব। এই বিপ্লবকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনরূপেও অভিহিত করা হয়। স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের কাছে কোনো আবেদন নিবেদন নয়, কোনো অহিংস আন্দোলন নয়, ইংরেজ শাসক ও তাদের দেশীয় দালালদের হত্যার মাধ্যমে ইংরেজদের ভিত নড়বড়ে করে ভারতবর্ষ থেকে তাদের শক্তিসামন্ত নিয়ে

দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা ছিল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। তবে এ আন্দোলনের শেষে এই ভূখণ্ডে স্বদেশী গান বা দেশাত্মবোধক গানের চর্চা অনেকটা ক্ষীণ হয়ে আসে।

অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তীতে শুরু হয় গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। এ সময় বাংলা স্বদেশী সংগীতের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। তাঁর আবির্ভাব পরাধীনতার বিরুদ্ধে মহান রূপকার হিসেবে বাংলা গানের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল স্থান লাভ করেছিল। তাঁর স্বদেশী গানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের সামগ্রিক মানসরূপটি প্রতিফলিত হয় এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণজাগরণের আহ্বান ধ্বনিত হয়। আবার কিছু গানে জেল-জুলুম মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা উঠে আসে। তবে বলাবাহুল্য নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। করুণাময় গোস্বামী, বাংলা গানের বিবর্তন গ্রন্থে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব নিয়ে উল্লেখ করেছেন :

> তিনি বহুসংখ্যক ও বহুমুখী সংগীত রচনা দ্বারা সেই শূন্যস্থান শুধু পূরণই করেন নি, বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারায় তিনি এক নব যুগের সূচনা করেছিলেন। সুরের উন্মাদনায় ও ছন্দের ঝঙ্কারে বীররসের এমন গভীর শক্তিকে তিনি বাংলা গানে সঞ্চারিত করলেন যে, তাঁর গান বিপুলভাবে অভিনন্দিত হল। ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের যে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল সে সময়, স্বাধীনতার জন্য আত্মাহুতি দেবার যে দুর্জয় সঙ্কল্প ধ্বনিত হচ্ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনে, তাতে পুরাতন গানের অনুবৃত্তিতে আর চলছিল না। নতুন ভাষা, নতুন সুরের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই রনসংগীতকে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল নজরুল ইসলামের রচনায়। [২৩]

নজরুলের রচিত স্বদেশী গানগুলো শোষণের বিরুদ্ধে সরাসরি সোচ্চার হতে শেখায়। কারণ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিলো। তবে নজরুলের সমসাময়িক দিপীপকুমার রায় (১৮৯৬-১৯৮০) ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭৪) সহ নিশিকান্ত রায় চৌধুরী (১৯০৯-১৯৭৩) যে ধরনের স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেক গানই যুগের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে অন্যতম "চাই স্বাধীনতা সাম্য চাই / গাহ দিকে দিকে চারণদল /পীড়িত দলিত বন্দী নর /সবলে দুহাতে ভাঙো শিকল"- বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের এই গানটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। কাজী নজরুল তাঁর দেশাত্মবোধক গানে নারীজাগরণের উদাত্ত আহ্বানও জানান। যা নারী জাগরণমূলক গান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এরমধ্যে অন্যতম "জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা"। আবার কিছু গানে পাওয়া যায় মুসলিম জাগরণের চিহ্ন। তিনি নির্দিষ্টভাবে মুসলিম সমাজের প্রতিও জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন। "বাজিছে দামামা/ বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান" ও "ধর্মের পথে শহীদ যাহারা/ আমরা সেই সে জাতি" অন্যতম বিখ্যাত গান। দেশাত্মবোধক ব্যাঙ্গগীতিতেও নজরুলের দক্ষতা ছিল অসামান্য। তার মধ্যে "সুপার (জেলের) বন্দনা", ও

"সাইমন কমিশনের রিপোর্ট" বিশেষভাবে উল্ল্যেখযোগ্য। তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে গান লিখতে গিয়ে লিখেছেন; "হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই' ও 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান"। আবার হিন্দু সমাজে প্রচলিত অস্পৃশ্যতার ধারণায় আঘাত করেও তিনি রচনা করেছেন, "জাতের নামে বজ্জাতি" ও "আজ ভারত ভাগ্যবিধাতার বুকে"। পরবর্তীকালে সকল স্বদেশ সংগীত রচনার প্রয়াসে নজরুলের দেশাত্মবোধক গীতরচনার ধারা প্রেরণার উৎস হিসেবে মেনে নিয়েছেন অনেকেই।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে গান হলো এক অপরূপ সৃষ্টি যা মানুষের মনোদৈহিক মুড পাল্টে দিতে পারে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে গান রচিত বা পরিবেশিত হয় তাকেই মূলত স্বদেশী গান নামে অভিহিত করা হয়। হিন্দুমেলার পূর্ব থেকে বঙ্গভঙ্গের পর পর্যন্ত চলমান এ আন্দোলন সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম স্বার্থের একটি রাষ্ট্রিক আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃত। রাজনৈতিক চরমপন্থী আদর্শের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট বাংলার উত্তেজিত শিক্ষিত যুবকদের কাছে এর আবেদন অতি সামান্য থাকলেও গঠনমূলক স্বদেশী প্রচারকদের সঙ্গে তাদের অনেকের যোগসূত্র ছিলো। স্বদেশী আন্দোলনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠা বিপ্লবীরা হাতে নিয়েছিলো কলম, লিখে ছিল দেশাত্মবোধক গান। যে গানের প্রাণশক্তি হয়ে উঠেছিল শত্রুকে কাবু করার অস্ত্র। স্বাধীনতার চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিলো এসব সৃষ্ট গানগুলো। গানের বাণী আর সুরে যেমন ছিলো দুঃসাহসিকতা আর শত্রু হটানোর মন্ত্র, তেমনি ছিল দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আকুতি। জনগনকে উদ্দীপ্ত করার অন্যতম মূল উৎস ছিলো এই সব গান।

তথ্যসূত্র

১. বিশ্বসভার গীতিকবি ড. হাসান রাজা, ভারত বিচিত্রা, বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ০৫ বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, মে ২০১৮ প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন পৃষ্ঠা, ১১।

২. *বাংলা গানের বিবর্তন*, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমি ঢাকা, পৃষ্ঠা, ২৫৬।

3. https://bn.wikipedia.org/wiki/ আবু হাকিম visiting date 10-05-2021.

৪. *বাংলা গানের বিবর্তন*, করুণাময় গোস্বামী, পৃষ্ঠা, ২৫৭।

৫. গীতা চট্যোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান*, *দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লী*. ১৯৮৩, ভূমিকা, পৃষ্ঠা, ৯

6. An Advanced History Of India by R.C Majumdar, H.C Raychaudhuri Kalilinkar Datta, 1961, P, 675.

7. https://genius.com/Bankim-chandra-chattopadhyay-vande-mataram-lyrics visiting date 10-03-2021.

৮. পাঁচুগোপাল বক্সি, *হামচূপামূ হাফ্ ও রবীন্দ্রনাথ*, পুনশ্চ প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা. ২২-২৩

৯. তদেব পৃষ্ঠা, ৭০

১০. তদেব পৃষ্ঠা, ৮২

11. https://www.bengalstudents.com/Madhyamik হিন্দুমেলা visiting date 10-03-2021.

১২. যোগেচন্দ্র বগাল, শুভেন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, ২০১৯, পৃষ্ঠা, ২৫-২৬

১৩. সম্পা. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা', পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত, পৃষ্ঠা, ১৯৮৯

১৪. যোগেশচন্দ্র বাগল শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত*, পৃষ্ঠা, ১৪

১৫. *বাংলা গানের বিবর্তন*, করুণাময় গোস্বামী, পৃষ্ঠা, ২৭৪

১৬. সুভাষ চৌধুরী, *মুক্তির গান*, দেশ বিনোদন, ১৩৯১, কলকাতা, পৃষ্ঠা, ১৮১।

১৭. রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী*, ১ম খণ্ড,কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৬, ভূমিকা, পৃষ্ঠা, ৫১

১৮. দিলিপকুমার রায় সম্পাদিত, *দ্বিজেন্দ্র কাব্যগঞ্চয়ন*, কলকাতা, ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটড পাবলিশিং কোং প্রা.লি, পৃষ্ঠা, ৫১

১৯. সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রসংগীতের স্বদেশচেতনা*, রবীন্দ্রখভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,কলকাতা ২০১১ পৃষ্ঠা, ১৫৭।

২০. *রবীন্দ্র সংগীতে স্বদেশ চেতনা*, পৃষ্ঠা, ১৬০

২১. তদেব পৃষ্ঠা, ১৫৯

২২. নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, *কান্তকবি রজনীকান্ত*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা ১৯৬৮, পৃষ্ঠা, ৫৪

২৩. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃষ্ঠা, ২৮৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের বাণী পর্যালোচনা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা শিল্প ও সাহিত্যে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টত যে বৃহৎ অধ্যায়টি ভেসে উঠে তা হলো রবীন্দ্র যুগ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় স্বাতন্ত্র ও সার্থকভাবে বিচরণ করেছেন। তবে রবীন্দ্র শিল্পসম্ভারের সর্বাধিক সমুন্নতার দৃষ্টান্ত তাঁর 'গান'। এ গানগুলোর কথা, সুর ও ছন্দের মধ্যে রয়েছে গভীর জীবনবোধের ভাবাবেগ ও দর্শন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত মোট স্বতন্ত্র গানের সংখ্যা ১৯১৫ টি। বাণীর ভাব-বৈচিত্র্যের দিক থেকে এ গানগুলোকে তিনি মূলত ৬টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক পর্যায়। এছাড়াও গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, নাট্যগীতি, জাতীয় সংগীত, পূজা ও প্রার্থনা, প্রেম ও প্রকৃতি প্রভৃতি পর্যায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানগুলোর বাণী-বৈচিত্র্য আমাদের চিত্তে শ্রুতিশৈলীর স্বাদ ও আকাঙ্খা তৈরি করে। রবীন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন; বাঙালীকে সুখে-দুঃখে আমার গান গাইতেই হবে। আবার অপরদিকে সমালোচক সুধীর চক্রবর্তী বলেছেন; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত কবি রূপে বিশ্ব স্বীকৃতি পেলেও গানের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর আত্মপ্রকাশের সাধনা ও নিরীক্ষা করে গেছেন।[১] রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎবাণী ও দৃঢ় প্রত্যয় সত্য প্রমাণ করে তাঁর রচিত গানগুলো শুধু রবীন্দ্র যুগের শ্রোতা ও পাঠকদের কাছে সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং বর্তমানে গায়ক, পাঠক ও শ্রোতার আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এর প্রধান কারণ তাঁর গানের বাণীর সাথে রয়েছে সুর ও ভাবের নিবিড় যোগসূত্র। যে যোগসূত্রের নিমিত্তে গানের প্রতিটি চরণ হয়ে উঠেছে শিল্পালঙ্কারের স্বার্থক উদাহরণ। তাই বর্তমান শিল্পী, শ্রোতা ও পাঠকের এক বৃহৎ অংশ রবীন্দ্র সঙ্গীতের শ্রবণ আর পাঠ তৃপ্তির উৎকর্ষতার গভীর ধ্যানে মগ্ন। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী, সুর ও ছন্দের স্বাদ সার্বজনীন নয়। একেক জনের মধ্যে একেকভাবে দোলা দিয়ে থাকে- একেকভাবে অর্থবহ হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আবু হেনা মোস্তফা কামালে'র বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য-

> "শব্দের অনিবার্য সঞ্চয়ে কবিতার যে-আবেগ চেতনার উপরিতলে দোলা দেয়, গানে তা-ই মর্মের মাঝখানে অনায়াসে ঠাঁই করে নেয়। গানের সুরে আছে সেই ধ্বনি যা সহজে সহৃদয়ের কাছে নানা ব্যঞ্জনায় অর্থবহ হয়ে ওঠে বারবার। সেজন্যেই সাধারণত গানের বাণীকে সুর থেকে আলাদা করলে একটি নিষ্প্রাণ কাঠামো ছাড়া কিছুই মেলে না। বোধ করি, কেবল রবীন্দ্রনাথের গানই ব্যতিক্রম। তাঁর যেসব গানের সুর এখনো আমার অশ্রুত, তাদের মূল্য তাই আমার কাছে কিছু মাত্র কম নয়। নিছক কবিতা হিসেবে পড়লেও যে-অন্তর্গত সুর গুনগুনিয়ে ওঠে আমার সকল চৈতন্যে, অনেক প্রসিদ্ধ সংগীতকারের সৃষ্টিতেও তেমন অনুরণন জাগে না। হয়তো সে আমার অক্ষমতা, অসামর্থ্য; কিন্তু সেই খানেই রবীন্দ্রনাথের জয়। তিনি পাষাণেও অনর্গল ফল্গুধারা বইয়ে দিতে পারেন। তাঁর প্রত্যাশা, ব্যর্থতা, প্রতীক্ষা ও পরিণামের সাথে অভিন্ন সম্পর্কে মুহূর্তেই আমি আন্দোলিত হয়ে উঠি বারবার। এমনি তীব্র ও অব্যর্থ সেই সংগ্রাম।"[২]

আবু হেনা মোস্তফা কামাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের বাণী সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যৌক্তিক। রবীন্দ্রনাথ গান রচনার ক্ষেত্রে অধিক সচেতন ও কৌশলী ছিলেন এবং তিনি তাঁর সংগীতের সামগ্রিক আলোচনায় বাণী সম্পর্কে বলেছেন- "গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি সংগীতকে তদোপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাঁহারা সংগীতকে কতকগুলো চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন। আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা কথার ভাবের উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য; আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।"[৩] সাধারণত গীতিকাররা যেখানে কথা বসান সুর বের করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সেখানে সুর বসান কথা বের করার জন্য। লক্ষ্যণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজ মন্তব্যে সুরকে অধিক প্রাধান্য দিলেও গানের বাণী বা চরণকে কখনোই নগণ্য করে নি। বরং তাঁর গানের বাণীতে গড়েছেন কাব্যরসের সমুন্নত বিস্তার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন " আমি যে গান তৈরি করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীত ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে।... হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর মুক্তপুরুষ ভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে। কথাকে শরিক বলে মান্‌তে সে নারাজ। বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগল মিলনের পক্ষপাতী।[৪] অর্থাৎ বাংলা সংগীতের ভাবদর্শনে সুর কথাকে খুঁজে সৃষ্টি করে এক মহাজাগতিক মহামন্ত্র। যে মন্ত্রের টানে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেন শিল্পী ও শ্রোতা। বাণী ও সুরের যখন সার্থক সন্ধি হয় ঠিক তখনই সংগীত হয়ে ওঠে উৎকর্ষ শিল্প। যদি গীত সৃষ্টিতে বাণী ও সুরের যথার্থ মিলন না ঘটে উৎকর্ষতার মানদণ্ড বিচারে তা হয় ব্যর্থ। তাই সুর যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ গানের বাণী। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বাংলা সংগীতের বিশেষত্ব যে কি, তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্রিত সংগীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্য রসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।"[৫] অর্থাৎ কাব্য ও সুরের মিলনেই হয় গান। অনেক সময় দেখা যায় কথার ভাব না বুঝে গানে আমরা ডুবে থাকি এই প্রসঙ্গে S.K. Langer বলেন;

> 'When words and music come together in song, music swallows worlds; not only mere world and literal sentences, but even literary word-structures, poetry. The Song is not a compromise between poetry and music, thought the text taken by itself be a great poem; song is music' [৬]

S.K. Langer চমৎকারভাবে বাণী সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তা সত্যিকার অর্থেই বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রেও প্রণিধানযোগ্য। কারণ শুধু শব্দ ব্যঞ্জনা-ই নয়, সংগীত একটি সাবলীল ও সামগ্রিক বিষয়। সংগীতের

কথা বা বাণী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে সকল বক্তব্যে সমকালীন গবেষক ও শিল্পী বিশেষ করে সংগীত শ্রোতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য এ বক্তব্য;

> সংগীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষ্য মাত্র করাই আবশ্যক; কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায় তবে সংগীত সেখানে খর্ব হইয়া পড়ে। কথার দ্বারা আমরা যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকি তাহা বহুল পরিমাণে সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট– কিন্তু আমাদের মনে অনেক সময় এমন ভাবের উদয় হয় যাহা বর্ণনায় প্রকাশ করিতে পারি না, যাহা কথার অতীত, যাহা অহৈতুক– সেই- সকল ভাব, অন্তরাত্মার সেই-সমস্ত আবেগ-উদ্‌বেগগুলি সংগীতেই বিশুদ্ধ রূপে ব্যক্ত হইতে পারে।[৭]

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন : "চিরদিনই মানুষ কথার সঙ্গে সুর জড়িয়ে গান গেয়ে এসেছে- সুর বড় না কি কথা বড় এ তর্ক ওঠে নি। যদি নিতান্তই তর্ক তোলা হয়, তাহলে আমি বলবো এক্ষেত্রে সংগীতই স্বামী, ভাষাকে সে আপন গোত্রে তুলে নিয়েছে" অর্থাৎ গানে কাব্য-সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপের মধ্যে পরমেশ্বরের মর্যাদা সুরেরই প্রাপ্য এবং এর পার্বতীর সম্মানটি কথা বা বাণীর।[৮]

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ পর্যায়ের গান রচনার ক্ষেত্রে বাস্তবতার সাথে কল্পনা ও ভবিষ্যৎ বাণীর সাথে অনুপ্রেণার বিশেষ যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। যা জোরালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সুর সংযোজনে। রবীন্দ্রনাথ গানের বাণীকে উপমহাদেশীয় অন্যান্য সংগীতকারদের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা বাণী মানব মনের বহুমাত্রিক অনুভূতি প্রকাশের সহায়ক। উল্লেখ্য মানুষের হৃদয়বৃত্তিক অস্তিত্বের দুটি দিক- একটি দেহগত ও অন্যটি আত্মিক। অর্থাৎ দেহগত বিষয় দৃশ্যমান এবং আত্মিক বিষয়টি অদৃশ্য। তদ্রুপ কবিগুরুর গানের বাণীতে ঠিক দুটি দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। প্রথমটি দৃশ্যমান ও দ্বিতীয় আত্মিক; যাকে বলা যায় দৃষ্টির অগোচরের ঘটনা। ফলে রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে উঠে অনুভূতিজাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের বাণীকে কবিতার ন্যায় কাব্যময় সাহিত্যশৈলী বলে আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন তাঁর গানের বাণী নেহাত কাব্যিক হলেও তা সুর ও ছন্দের মাধ্যমেই শ্রুতি শৈলীর আকাঙ্খা সৃষ্টি করে। তিনি গানকে কবিতার সাথে তুলনা করলেও স্বদেশ পর্যায়ের গানে কবিতার মতো প্রতীক-উপমা-রূপক-রূপকল্পকে প্রাধান্য দেন নি বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনূভূতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব যে তাঁর সমস্ত সাধনা ও সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে তা স্মরণে প্রমথ চৌধুরীর আলোচনা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়-

> 'কবিত্ব-শক্তি বস্তু যে কী, তা লজিকের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না', সেই কথাটাই পুনরায় স্মরণ করে মেনে নিতে হয়, কবিত্ব যে আসলে দৈববাণী-রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যাখ্যাটাই কবিত্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিচয়। তাই দৈববাণী বলেই কবিত্বটা যেমন কবির একলার ভোগ্য বিষয় নয়, তেমনই সেটা দেশকালের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখারও জিনিস নয়। তার প্রকাশ এবং উপভোগ দুটোতেই চিরকালীন বিশ্বমানব সমানে অংশ নিয়ে চলেছে। কেননা, এখনো

> আমার এই বিশ্বাস যে সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে ; তাহার এক জায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।"[৯]

প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকে দৈববাণীর ন্যায় তুলনা করেছেন। এই তুলনা ইতিবাচক অর্থে মানবতার নিগূঢ়তম সত্যতার প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ যে ভাষা থাকে প্রকৃতিতে, নিসর্গের নৈঃশব্দে তা তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গানে সরল ও সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই ধারার গান রচনায় তিনি উদ্দেশ্যের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। ফলে তিনি ভাব-রস, রূপ-সৌন্দর্য্য ও দুঃখ-বেদনার আবেগসিক্ত ব্যঞ্জনা স্বল্পকথায় সরল বাণীতে বোধগম্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতচিন্তা গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

> আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন-কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সঙ্গীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই।[১০]

সুন্দর ও সার্থক বাণী ছাড়া ভাব, রস ও শ্রুতি-শৈলী সম্পন্ন সংগীত বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। মানুষের মুখের ভাষার সাথে শিল্পের ভাষার অনেকাংশেই পার্থক্য রয়েছে; কেননা 'শিল্প হ'ল প্রকাশ'[১১]। আর এই প্রকাশ মাধ্যম যদি আকর্ষণীয় না হয়ে উঠে তাহলে তা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হয়।

আলোচ্য বিষয়ে রৈখিক চিন্তার নিমিত্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ পর্যায়ের গানের বিষয় বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হলো–

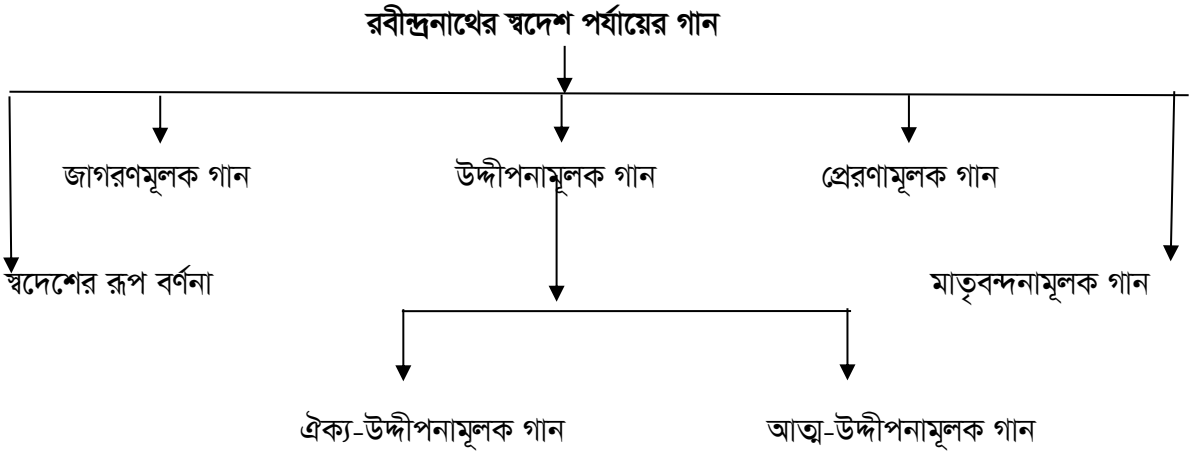

১. স্বদেশের রূপ বর্ণনামূলক গান

প্রকৃতির অপরূপ লীলাভূমি এই ভূখণ্ড। এ ভূখণ্ডে ঋতুচক্রের পালা-বদলে চক্রাকারে প্রকৃতির নানা রং, রূপ, রস ও ঘ্রাণের ভিন্নতা খেলা করে। তাই বাংলার এই অলংকার সৌন্দর্য্য শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। এ মুগ্ধতায় অন্যান্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ একটু বেশিই ব্যাকুল হয়েছেন। ফলে তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গানে বাংলার রূপ-বৈচিত্র্যের নিখুঁত বর্ণনা ফুটে উঠেছে। যেখানে দৃশ্যায়িত হয়েছে দেশের নানা রূপশৈলীর সাথে মানব মনের আত্মিক বন্ধনের নিবিড়তা। এ পর্যায়ের গানগুলোর মধ্যে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি', 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা', 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে', 'অয়ি ভূবনমনোমোহিনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিচের ছকে স্বদেশের রূপ বর্ণনামূলক গানের তালিকা, সংখ্যা, রচনাকাল ও প্রকাশকাল উপস্থাপন করা হল।

ক্রমিক নং	গান	সংখ্যা	রচনাকাল	প্রকাশ সাল
১.	আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।	১নং	২২ শ্রাবণ/১৩১২ ৭ আগস্ট ১৯০৫	

২.	ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা	২নং		আশ্বিন ১৩১২ সেপ্টেম্বর- অক্টোবর ১৯০৫
৩.	আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি	২১নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৪.	অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা,	২৩নং	পৌষ-১৩০৩ ডিসেম্বর ১৮৯৬ (পিসি বোস ১৯০৫ সালে গানটি রেকর্ড করেন। ধারণা করা হয় এটিই প্রথম রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ড)	

উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ পর্যায়ের অধিকাংশ গানগুলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও এর মধ্যে বেশকিছু গান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে রচিত। এ গানগুলোর বাণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে স্বদেশের রূপ বর্ণনার সাথে স্বদেশের প্রতি আশা আকাঙ্ক্ষা, হতাশা ও অন্তসার-শূন্যতার সুর ধ্বনিত হয়েছে।

১.১ গান নং -১

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥...[১২]

উল্লিখিত গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। বাউল গগন হরকরা'র অমর সৃষ্টি "আমি কোথায় পাবো তারে/ আমার মনের মানুষ যে রে।" গানটির সুর অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গানটি রচনা করেন। যার বাণীতে স্বদেশের প্রতি গভীর প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। এ গানটিতে দেশ ও জাতি গৌরবের কোনো বর্ণনা নেই; রয়েছে বাংলার রূপকথা, গৌরবময় ইতিহাস ও অপরূপ সৌন্দর্য্যের কাব্যিক বর্ণনা। যে বর্ণনায় 'আমার সোনার বাংলা' কথাটি কল্পনামূলক অলংকার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। "ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে/মরি হায়, হায় রে" এ বাণীতে ছন্দোময় কাব্যিক মূর্চ্ছনার প্রাধান্য দেখা যায়। এ গানের বাণীতে বিশেষভাবে বাংলার প্রকৃতির বর্ণনা নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। 'মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি' এখানে রবীন্দ্রনাথ জন্মভূমি ও মা'কে একই সূত্রে গেঁথেছেন। অন্যদিকে আমার সোনার বাংলার 'সোনা' শব্দটিকে 'স্বর্ণ'র সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ স্বর্ণ বা সোনা দিয়ে গড়া বাংলার প্রতি চিত্তের বন্ধনকে বুঝিয়েছেন। বাউল অঙ্গের এই গানটিতে কবি নানা রকম রূপকতার আশ্রয় নিলেও বাণীর ও ভাবের ক্ষেত্রে ছিলেন সরল পথের যাত্রী। যে বাণী ও ভাব বাঙালির মানসিক তৃপ্তিতে গভীরভাবে ফলপ্রদ। বাউল অঙ্গের গানে সাধারণত জটিল শব্দ প্রয়োগ দেখা যায় না কারণ এ গানের বাণীতে ভাব ও দর্শনের অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়। তেমনি উল্লিখিত গানটিতে সহজ সরল সাবলীলতার আশ্রয়ে স্বদেশের রূপবৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটেছে। উল্লেখ্য কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানটির একেবারে শেষ পংক্তিতে 'পরের ঘরে কিনব না মাগো ভূষণ বলে গলার ফাঁসি' বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ইঙ্গিত করেছেন।

১.২ গান নং- ২

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা
ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে... [১৩]

উপরিযুক্ত গানটিতে দেশপ্রেমের কল্যাণকর মানবতাবাদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। এ গানের সুর ও বাণীতে ফুটে উঠেছে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসায় ব্যাকুল হয়ে নুয়ে পড়ার স্নিগ্ধ আকুলতা। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ এ গানে নিঃষ্পাপ শিশুর কাদা জল কিংবা ধুলোমাখা শরীরে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুগ্ধ পানের তৃপ্তির সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন 'তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা/ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা' অর্থাৎ–এ বাংলার সমগ্রভূমি মায়ের আচঁলের ন্যায় শুদ্ধ ও প্রশান্তিময়। এখানেই লুকিয়ে আছে বিশ্বপ্রেম। ফলে গানটির বাণীতে স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয় দেশকে ভালোবাসাই বিশ্বকে ভালোবাসার সামিল। যার সাথে আমাদের দেহ-মন নিবিড় বন্ধনের শিকড়ে বাঁধা। কবি গানটিতে স্বদেশ প্রেমের মধ্যে দিয়ে বিশ্বপ্রেমের প্রকাশ করেছেন। এ গানটিতে অন্ন, শীতল জল, কোলে জনম, বুকে মরণ 'পরে খেলা ইত্যাদি শব্দের অবতারণা বিশেষভাবে অলংকৃত করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই গানটির মাধ্যমেই বাংলার কায়ায় দেখেন বিশ্বের ছায়া, শুধু তাই নয় তাঁর বিভিন্ন অমর সৃষ্টিতেও বলেছেন বিশ্বকে চিনে নেয়ার কথা। তার মধ্যে অন্যতম উদাহরণ হলো 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি/তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি'। গানের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখার কথা বলেছেন। কবি এই অনুভব- উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই স্বদেশী গানটি রচনা করেছেন। এখানে বিশ্লেষিত গানটির বাণীতে শিল্পমানের উৎকর্ষতার প্রমাণ মেলে।

১.৩ গান নং- ৩

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥...[১৪]

গানটি কবিতা ও গান দু'ভাবেই বাঙালির মনে বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। এই গানে রবীন্দ্রনাথ কতোগুলো রূপক ও সহজ শব্দ প্রয়োগে মাতৃভূমির রূপ বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে বাংলাদেশের সৌন্দর্য্যের মুগ্ধতা ফুটে উঠেছে। তিনি দেশের প্রতি মমতা প্রদর্শন করেছেন। এখানে ধর্ম না থাকলেও মাতৃভূমির প্রতি

শৃঙ্গার রস প্রতীয়মান। মাতৃভূমির অপরূপ রূপ দেখে কবি চোখ ফেরাতে পারছেন না। এ গানটিতে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভূমির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধতার কথা যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি মাতৃরূপে দেশের অবস্থান প্রকাশ করেছেন মায়ের অগ্নি মূর্তিরূপে। বাংলাদেশের হৃদয় হতে যে আকাঙ্ক্ষা, যে স্বপ্ন, যে প্রত্যাশার বাণী ভেসে আসে সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের শক্তি নিয়ে বাংলার মাটি থেকে সৃষ্টি হওয়া রূপের মূর্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের এ গানে। মাতৃরূপে দেশ যেমন তাঁর সন্তানকে আগলে রাখে স্নেহ মায়ায়, তেমনি তার সন্তানকে রক্ষা করার জন্য হাতের খড়্গ নিয়ে মেতে ওঠেন তাণ্ডবলীলায়। যে সোনার মন্দিরে দুয়ার খোলার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই গানে সেই সোনার মন্দির এই দেশ, এই মাটি, এই মাটির ঘর। মলিন হাসি, দরিদ্রবেশ সমস্ত আভরণ খুলে যায় দেশের মুক্তির ভেতর দিয়ে আর দেশের মুক্তি তখনই ত্বরান্বিত হয় যখন অভয়মন্ত্র বেজে ওঠে হৃদয় মাঝে। অন্তরে অভয়ের বাণী দিয়ে মাতৃভূমির অপ্রতিরোধ্য শক্তির বর্ণনা করেছেন এ গানের প্রতিটি পংক্তিতে।

১.৪ গান নং- ৪
অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা,

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননিজননী ॥
নীল সিন্ধুজলধৌতচরণতল, অনিলবিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল, শুভ্রতুষারকিরীটিনী ॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন--
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা পুণ্যপীযুষস্তন্য বাহিনী ॥...[১৫]

১৮৯৬ সালে ২৮ শে ডিসেম্বর কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত গানটি রচনা করেন। অতুলপ্রসাদ সেন গানটি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন 'কলিকাতায় একবার কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক গণ্যমান্য প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। প্রবাসীরা বাংলা জানেন না অথচ অনেকেই সংস্কৃত জানেন, তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত বাণীবহুল এ গানটি রচনা করেছিলেন।

উক্ত গানে কবি উপমা যুক্তির আশ্রয়ে বাণীর বৈচিত্র্যের মাধ্যমে সংগীত বির্নিমাণ করেছেন। গানটিতে কবি জন্মভূমিকে মা সম্বোধন করে দেশের রূপ বর্ণনা করেছেন। কবি বলেছেন "ভুবনমনোমোহিনী মা" এখানে একই সাথে উপমা অলংকার দুইটাই ব্যবহার করেছেন। উপমা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সাদৃশ্যে ও বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা। কবি এখানে গানের শুরুতেই দুইটি শব্দ প্রয়োগে বাক্যেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন।

সংস্কৃত শব্দবহুল স্বদেশ পর্যায়ের এই গানটিতে স্বদেশের ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হয়েছে। গানটিতে নদী, প্রকৃতি, সবুজ চাদরে ছাওয়া মাটির বক্ষ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি প্রকৃতির বর্ণনার মাধ্যমে স্বদেশের মনোমুগ্ধকর রূপ প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আশ্রয়দাত্রী জন্মভূমিকে কবি মাতৃরূপে কল্পনা করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসেরা ভূমির মর্যাদা দিয়ে মাতৃভূমিকে উপস্থাপন করেছেন।

২. জাগরণরমূলক গান

জাগরণমূলক গান নিষ্ঠুরতা, বঞ্চনা, গভীর দহন থেকে মানবমনে প্রাণোচ্ছাসের নবচেতনা তৈরি করে। বিদ্রোহী চেতনা জাগিয়ে তুলতে গান হয়ে উঠে শাণিত অস্ত্র। বিপরীতে রবীন্দ্রনাথের গানে পরাধীনতার গ্লানি ও অতীত গৌরব হারানোর লজ্জা বিষাদে পরিণত হতেও দেখা যায়। রবীন্দ্র পূর্ববতী ও পরবর্তী জাগরণমূলক গানগুলোর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের গানে তার সরাসরি সাদৃশ্য দেখা না গেলেও ভিন্নধারার বিস্তার ঘটে নি। অর্থাৎ গানগুলোতে কখনও ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, আবার কখনো কখনো লজ্জা নৈরাশ্য থেকে মানুষকে জাগরণের আহ্বান করতে দেখা যায়। এ গানগুলোর মধ্যে "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো/একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো॥" "শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান/সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান", "চলো যাই, চলো, যাই চলো, যাই/চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে", "আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে/কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া", "মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর", "মহোজ্জ্বল আজ হে/বর পুত্রসঙ্গ বিরাজ হে", প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নিম্নের ছকে উল্লেখিত জাগরণমূলক গানগুলোর পরিচয় উল্লেখ করা হলো।

ক্রমিক নং	গান	সংখ্যা	রচনাকাল	প্রকাশসাল
১.	ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।	৪২ নং	কার্তিক ১৩৪০ অক্টোবর- নভেম্বর ১৯৩৩ ইং	
২.	শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান।	৪০ নং	১০ মাঘ ১৩৪৩ ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৭	
৩.	চলো যাই, চলো, যাই চলো, যাই	৩৯ নং	১০ মাঘ ১৩৪৩ ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৭	
৪.	আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।	১৯ নং		ফাল্গুন-১২৯৯ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৮৯৩
৫.	মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে	১৭ নং	১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ ৩০ নভেম্বর-১৯১৭	
৬.	আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না	২২নং	২ অগ্রহায়ন ১২৯৩ ১৭ নভেম্বর-১৮৮৬	
৭.	আজি এ ভারত লজ্জিত হে	৩৮ নং		ফাল্গুন ১৩০৬ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৮৯০
৮.	ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে	৪৩ নং	২২ আশ্বিন ১৩১২ ৮ অক্টোবর ১৯০৫	
৯.	বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান	৪৪ নং	২১ আশ্বিন ১৩১২ ৭ অক্টোবর ১৯০৫	

১০.	মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?	২৯ নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
১১.	রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে?	৩৬ নং	১৩ চৈত্র ১৩১৫ ২৬ মার্চ ১৯০৯	

২.১ গান নং- ৫

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো॥
দুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শুরু,
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু
পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো॥
নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি
দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই-বা দেখি।
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,
ভাব্‌নাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া
বজ্রশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো॥ [১৬]

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের জাগরণমূলক গানে রয়েছে বিশেষ স্বকীয়তা। তিনি এ পর্যায়ের গানগুলোতে ভাব ও বাণীকে রূপকের আশ্রয়ে আড়াল করেন নি। যার কারণে জাগরণের গানগুলো কথার আড়ালের কাব্যময় গভীরতা থেকে মুক্ত। তাই উপরিযুক্ত গানটির ভেতর-বাহির অভিন্ন। এই জাগরণ মূলক গানে বাঙালির জীবনাচরণের স্বাদৃশ্যতা ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।" বাক্যের অর্থ ভিত্তিক প্রকারভেদ অনুযায়ী এটি একটি অনুজ্ঞাসূচক বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য। যে বাক্যে আদেশ, উপদেশ ও অনুরোধ প্রকাশ পেয়েছে। এখানে কবি ব্যর্থতার আর্বজনাকে পুড়িয়ে ফেলার আহ্বান করেছেন। এ গানের পরবর্তী চরণে বলেছেন "একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো"॥ কবি এখানে পরাধীনতার পথ থেকে নতুন পথের সন্ধান করেছেন। এ গানে কবি ভাবের জগৎ ছেড়ে অ-ভাবের দিকে নজর দিয়ে বাস্তবতাকে

উপলব্ধি করেন। গানটির সমগ্র বাণী বিশ্লেষণ করলে আরও প্রতীয়মান হয় যে, দুন্দুভি (দামামা জাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র) বাজিয়ে সকলের মনে অনুরণন তুলে সুপ্তি ভেঙ্গে জেগে উঠার ও একত্রিত হবার আহ্বান করেছেন। তাই স্বাধীনতার স্বপ্নে মগ্ন জাতিকে সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে অতীতের ব্যর্থতা ভুলে আবার জেগে উঠতে বলেছেন।

২.২ গান নং ৬
শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান।

শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান।
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।
চির-শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে
লহ সে অভিষেক ললাট পরে...[১৭]

রবীন্দ্রনাথের সংগীত সাধনার অন্যতম অঙ্গ জাগরণমূলক গান। তাঁর অনেক গানের ন্যায় এই গানেও প্রাচীন বন্দিদশা ভেঙ্গে মনুষ্যত্বের সাধনা করে সামনে এগিয়ে যেতে বলেছেন। তিনি বলছেন 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান/ সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান'। জীবনে দুঃখ আছে দৈন্য আছে, আছে আশা ভঙ্গের হতাশা। সেই হতাশাকে জয় করে নিজেকে জাগরিত করাই এই গানের লক্ষ্য। নির্ভয় গান ব্যক্তি জীবনের সব হতাশা সংশয় দূর করবে। রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন 'চির-শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে/লহ সে অভিষেক ললাট পরে' অর্থাৎ পরমেশ্বরের আশীর্বাদ ঝর্ণার ন্যায় আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। কবি সেটাকে নিঃশঙ্কচিত্তে মাথা পেতে নিতে বলেছেন। স্রষ্টার আশীর্বাদ নিয়ে নূতন নির্মল প্রাণকে অর্থাৎ জীবনকে ত্যাগের মহিমায় দীক্ষা নিতে হবে। কলুষমুক্ত হতে হবে নিজের স্বার্থ ভুলে। এ গানের বাণী ও সুরশৈলীর যুগলসম্মিলনে সেই চেতনার ঝংকার ধ্বনিত হয়েছে। যার জন্য সমগ্র গানটিতে গভীর অর্থভিত্তিক চেতনার আভাস ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানে 'চলো' শব্দটির বেশি ব্যবহার থাকলেও তিনি এ গানে 'চল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বলছেন চল যাত্রী, চল দিনরাত্রি/কর অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান। এখানে চল শব্দটি প্রয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ বেশকিছু শব্দের অবতারণা করেছেন। যেমন দিনরাত্রি, অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান, ক্লান্তিজাল, অপরাজিত চিত্তে, মৃত্যুতোরণ প্রভৃতি। ফলে চল শব্দটি গতিময় কিংবা ক্রিয়াশীল প্রতীক হিসেবে প্রয়োগ হয়েছে।

২.৩ গান নং ৭

চলো যাই, চলো, যাই চলো, যাই

চলো যাই, চলো, যাই চলো, যাই
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে!
চলো মুক্তিপথে,
চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে...[১৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক গানের অধিকাংশেই বিচিত্র সুরশৈলীর প্রধান্য দিলেও গঠনরীতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজস্ব শৈলীর স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখেছেন। উপরিযুক্ত গানের প্রথম চার চরণে দেখা যায় যায় "চলো যাই, চলো, যাই চলো", "যাই/চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে/চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে!/ চলো মুক্তিপথে" গানে 'চলো' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ছয় বার। আবার পরবর্তী দুই লাইনে মোট চার বার "করো ছিন্ন" শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যেমে বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথ স্বপ্নকুহকে ছিন্ন করার আহ্বান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ গানটিতে "বলো জয়" শব্দটি ব্যবহারের মধ্যদিয়ে জড়তার জর্জর বন্ধে, দুর্গমদূরপথযাত্রী, নির্ভয় প্রভৃতি অবস্থাকে জয় করার ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন। যা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত চিন্তার ফসল। জাগরণমূলক গান হলেও উক্ত গানের অন্তরার বাণীগুলোতে প্রেরণার আভাস লক্ষ্য করা যায়। যেমন "থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ/জড়তার জর্জর বন্ধে/বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়। অপরদিকে এ গানটির শেষের চরণগুলোতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করেন "বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়/ বলো নির্মল জ্যোতির জয় বলো ভাই॥/ হও মৃত্যুতোরণ উত্তীর্ণ,/ যাক ভেঙে যাক যাহা জীর্ণ,/ চলো অভয় অমৃতময় লোকে, অজর অশোকে, বলো জয় বলো জয়" ইত্যাদি। যে আহ্বান চূড়ান্ত সত্যের, যে আহ্বান মুক্তির, যে আহ্বান জয়ের সেই অনিবার্য সুন্দরে সমর্পিত হওয়ার ডাক দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের এই গানটিতে। মানুষের মনকে উদ্দীপ্ত করার রসদ রয়েছে গানটির বাণীতে। সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তির মঞ্চে একত্রিত হয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনার শক্তিশালী শব্দ "চলো যাই"। গানটিতে মুক্তির জয়বার্তাকে চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করেছেন। মৃত্যুর ভয়কে, জড়তাকে, জীর্ণতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে স্বদেশের কাজে মত্ত হওয়ার প্রেরণা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এ গানটিতে।

২. ৪ গান নং- ৮
আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া,
বলো 'উঠ উঠ' সঘনে গভীর নিদ্রামগনে ॥
হেরো তিমির রজনী যায় ওই, হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী--
নব আনন্দে, নব জীবনে,
ফুল- কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকল কূজনে॥...[১৯]

বর্তমান বিশ্লেষিত গানটি জাগরণমূলক গানের পর্যায়ভূক্ত হলেও গানের বাণীতে অনুপ্রেরণার উপাদানও লক্ষ্য করা যায়। সুরশৈলীর দিক থেকে জাগরণের অর্থ বহন করে না। তবুও বাণী বৈশিষ্ট্যের খাতিরে জাগরণের গান হিসেবে বিশ্লেষণ করা জরুরী। কারণ জাগরণের আত্মপ্রত্যয়ী জীবনদৃষ্টি উক্ত গানের বাণীতে উপস্থিত। গানের বাণীতে বলেছেন "আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে/ কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া/ বলো উঠ উঠ সঘনে গভীর নিদ্রামগনে॥" সরল বাণী ব্যঞ্জনায় এখানে বিশেষ ভাব ফুটে উঠেছে। কবি এখানে আনন্দধ্বনি জাগানোর ভাব ব্যক্ত করেছেন। যাঁরা নতুন সূর্যোদয়ের আশায় আছেন আর যারা নিদ্রামগ্ন আছে তাদের জেগে উঠার আহ্বান করেছেন। নব আনন্দে প্রাণের আঁধার দূর হয়ে আলো উদ্ভাসিত হচ্ছে। মানবতার উন্নতি সাধনের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে বলেছেন। অযথা স্বপ্ন দেখে সময় ক্ষেপন করার সময় নেই। কবি বলেছেন, "ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নবসাজ, আরম্ভ করো জীবনের কাজ/ সরল সবল আনন্দমনে, অমল অচল জীবনে।" জীবনের যত জীর্ণ শোক সংশয় দুঃখ স্বপন ইত্যাদি আছে তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নবসাজে সজ্জিত হয়ে জীবন বির্নিমাণে নিজেকে বিসর্জন করতে আমন্ত্রন করেছেন। মানব সমাজে মানবের কাজে নতুন রূপে নবউদ্যোমে কর্মযজ্ঞ সৃষ্টি করার আহ্বান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

এ গানে জীর্ণতা, হীনতা, পুরাতনের টান, আলস্য, নিদ্রামগ্নতা-ভেঙ্গে মানবকল্যাণে নিবেদিত ও জাগ্রত করার প্রয়াস রয়েছে গানটিতে। অন্তর্মুখী স্বার্থ চিন্তার বেড়াজাল ছিন্ন করে বাহির জগতে প্রবেশের ভেতর দিয়ে স্বদেশের দৈন্যতা মোচন করার জন্য অন্ধকার থেকে আলোর পথে মানবসমাজকে ডাক দিয়েছেন এ গানে।

২. ৫ গান নং ৯

মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে

মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে

বর পুত্রসঙ্গ বিরাজ' হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর', লহ' জ্যোতিদীক্ষা,
যাত্রীদল সব সাজ' হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে...[২০]

এ গানটি জাগরণমূলক গানের পর্যায় ভূক্ত। এখানে প্রথম কয়েক চরণে স্বদেশ বন্দনার আভাস বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। "মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে" অর্থাৎ মাতৃভূমির পবিত্র অঙ্গন আলোকিত করার জন্যে আহ্বান করেছেন। কবি শঙ্খের পবিত্র ধ্বনির মাধ্যমে সমবেত বীরবৃন্দদের বরণ করতে বলেছেন। যারা দেশমাতৃকার জন্যে নিজের মনোপ্রাণ উৎস্বর্গ করতে প্রস্তুত। কবি বীরবৃন্দকে জ্যোতি দীক্ষা নিয়ে অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা করতে বলেছেন। বীর পুরুষের জয়গান গেয়ে সাধকদের মাতৃভূমির জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কবি এ গানে সকল যোগী, সকল ত্যাগী, দুঃসহদুঃখভোগী, জ্ঞানী কর্মীদের সাথে মঙ্গল গৌরব পূণ্য সৌরভে এক হতে বলেছেন। তেজঃসূর্য উজ্জ্বল আলোকে মাতৃভূমির আকাশ বাতাসকে আলোকিত করতে। উক্ত গানটিতে স্বাধীনতার প্রতীক্ষা শেষ করে নূতন আলোর দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান রয়েছে।

২ উদ্দীপনামূলক গান

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলোর মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক গানের বাণীতে উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গানে সরাসরি বিদ্রোহী চেতনার উপস্থিতি না থাকলেও এ পর্যায়ের গানে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করতে দেখা যায়। যার কারণে এ পর্যায়ের গানকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি–

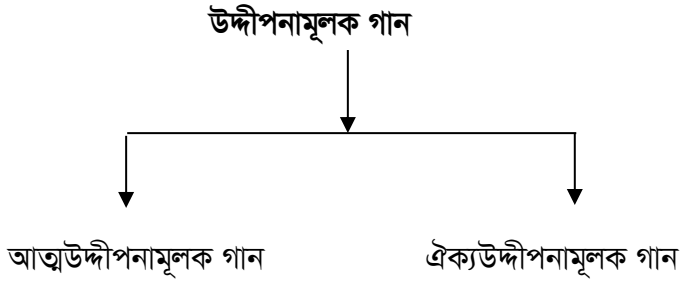

৩.১ আত্মউদ্দীপনামূলক গান

এই পর্যায়ের গানগুলোতে আত্মউদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। জীবনবোধের বহুমুখী সংকটময় অবস্থানে ভুল চিন্তায় নুয়ে না পড়ে সম্মুখে এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আত্মউদ্দীপনামূলক গানের মাধ্যমে বিশেষ তাগিদ ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি এখানে স্পষ্টত আত্মবিশ্বাসী হয়ে শোষকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান করেছেন। যেমন 'আমি ভয় করব না ভয় করব না/দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥" "আগে চল্, আগে চল্ ভাই! /পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে", "ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি", "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে", "ঘরে মুখ মলিন দেখে", "যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না/ তবে তুই ফিরে যা-না", "বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি/বারে বারে হেলিস নে ভাই", "ওরে, নূতন যুগের ভোরে/দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে॥" ইত্যাদি গানগুলোতে আত্মউদ্দীপনার সুর ভেসে ওঠে।

ক্রমিক নং	গান	সংখ্যা	রচনাকাল	প্রকাশসাল
১.	আমি ভয় করব না ভয় করব না।	৭নং		আশ্বিন ১৩১২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

২.	আগে চল্, আগে চল্ ভাই!	১৮ নং		বৈশাখ ১২৯৪ এপ্রিল- মে ১৮৮৭
৩.	যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না।	২৮ নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৪.	ওরে, নূতন যুগের ভোরে	৪১ নং	বৈশাখ ১৩৪৪ ১৪ এপ্রিল ১৯৩৭	
৫.	ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি,	২৭ নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৬.	বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই!	৩৩ নং		আশ্বিন ১৩১২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৭.	সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে?	৪৬ নং	৩ মাঘ ১৩২৮ ১৭ জানুয়ারি ১৯২২	
৮.	ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি	৩০নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

৩.২ ঐক্যউদ্দীপনা মূলক গান

এই ধারার গানে রবীন্দ্রনাথ ঐক্যের বন্দনা ও সমষ্টিক উদ্দীপনার কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন "আমরা সবাই রাজা'", "আমরা পথে পথে যাব সারে সারে", "আমাদের যাত্রা হলো শুরু", "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে", "এবার তোর মরা গাঙে", "নিশিদিন ভরসা রাখিস", "এখন আর দেরী নয়" প্রভৃতি। ব্যক্তির ক্ষুদ্র চিন্তা-চেতনা ও চিত্তবোধের সমষ্টিগত উপলব্ধির ভাবাদর্শের আকাঙ্খায় ঐক্যউদ্দীপনামূলক গানের দর্শন নিহিত।

ক্রমিক নং	গান	সংখ্যা	রচনাকাল	প্রকাশসাল
১.	এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী॥	৫নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
২.	নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।	৬ নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৩.	আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।	৯নং	পৌষ ১২৯৩ ডিসেম্বর ১৮৮৬	
৪.	আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে	১০নং		২২ পৌষ ১৩১৭ ৬ জানুয়ারী ১৯১০
৫.	আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।	১৩নং	২১ আশ্বিন ১৩১২ ৭ অক্টোবর ১৯০৫	
৬.	এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো।	৩২নং		কার্তিক ১৩১২ অক্টোবর-নভেম্বর ১৯০৫
৭.	আমরা পথে পথে যাবো সারে সারে	৩৪নং		আশ্বিন ১৩১২ অক্টোবর ১৯০৫

৩.১ আত্মউদ্দীপনা মূলক গান

৩.১. ২ গান নং- ১০
আমি ভয় করব না ভয় করব না।

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না॥
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে
সহজ পথে চলব ভবে পড়ব না, পাঁকের পরে পড়ব না॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না॥... [২১]

পরাধীনতার গ্লানি দূর করে মানবমুক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্খার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের কিছুসংখ্যক গানে আত্মউদ্দীপনামূলক প্রেরণা দেখা যায়। জীবন ও সংগ্রামের সংকটময় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন অভয়বাণী, উপরিযুক্তগানটি এই অভয়বাণীরই বহিঃপ্রকাশ। এখানে কবি বলেছেন- জীবন সংগ্রামের পথে মানুষকে হতে হয় নির্ভীক। তাই তিনি লিখেছেন "আমি ভয় করবো না, ভয় করবো না"। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ গানের বাণীকে প্রতীকি অর্থে নদী ও নৌকার চালকের যোগসূত্রকে ইংঙ্গিত করেছেন। সকল বাধা-বিপত্তি উতরে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে মানুষকে অবিচল থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন। এ গানে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে বিপদকে মোকাবিলা এবং হাল না ছেড়ে সংগ্রামের পথে উদ্বুদ্ধ করেছেন ।

৩.১.২ গান নং- ১১

আগে চল্, আগে চল্ ভাই!

আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই...[২২]

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সাধনার অন্যতম বিশাল কীর্তি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সংগীতের মধ্যদিয়ে। আলোচিত গানটিতে আত্মউদ্দিপনামূলক উপাদানে ভরপুর। এ গানে কবি প্রকাশ করতে চেয়েছেন স্বাধীনতা পেতে হলে জীবন আর মৃত্যুর কথা মিছে মিছে ভেবে সময় নষ্ট করার সময় নেই। তাই তিনি জীবনের লক্ষ্য স্থির করে পথ চলার কথা ব্যক্ত করেছেন। এ গানে রবীন্দ্রনাথ মৃতের মত পড়ে না থেকে পিছুটান ছিন্ন করে স্বদেশের

জন্য এগিয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। মোহের বাঁধন ছিন্ন করে পরাধীনতার ক্রন্দনের অবসান ঘটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার ডাক রয়েছে গানটিতে। দেশের জন্যে রবীন্দ্রনাথ মানবসন্তানকে প্রয়োজনে একা এগিয়ে যেতে আহ্বান করেছেন। সফল জীবনের মানেই হলো শুধু এগিয়ে যাওয়ার গল্প। তাই তো গানে বলেছেন বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই! আগে চল্, আগে চল্ ভাই ॥ কবি আবার বলেছেন "প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়/দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়" উক্ত লাইনে আত্মউদ্দীপনার পাশাপাশি প্রেরণার আভাস প্রতীয়মান হয়। যেখানে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন সময় কারও জন্য বসে থাকে না। সময় চলে তার নিজ গতিতে। কারও সুযোগের বা আশায় বসে না থেকে সামনে এগিয়ে যেতে বলছেন। আরো পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে কবি নিজেকে দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন ঐ সব মানুষদের যারা কাজ পছন্দ করে না। তারা অলসভাবে সময় নষ্ট করে ফলে তাদের মন-মানসিকতা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে কেননা উদ্দেশ্যহীন ভাবে লক্ষ্য ছাড়া বেঁচে থাকা মানে মৃত্যুর সমতুল্য। এতে মানুষ তার কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে। শুধু তাই নয় পাশের পিছিয়ে পড়া মানুষকেও সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ যারা সমাজের পিছনে পড়ে থাকে তাদের জীবনের গতিও থেমে যায়। এমনভাবে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে। গানের বাণীতে আরো স্পষ্ট হয়েছে যে জীবনে নানা বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ মনে করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। গতিতেই জীবন-স্থিতিতেই মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথ এ গানের বাণীতে কোনো উপমা অলংকার ব্যবহার করেন নি। গানের বাণী এখানে নির্ভেজালভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

৩.১.৩ গান নং ১২

যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না।

যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না।
যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা॥
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে ভুলবি যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর হাত কাঁপে তো নিবিয়ে আলো সবারে করবি কানা॥
যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাহে মন করিস ভারী বোঝা আপন
তবে তুই সইতে কভু পারবি নে রে এ বিষম পথের টানা॥
যদি তোর আপনা হতে অকারণে সুখ সদা না জাগে মনে
তবে তুই তর্ক করে সকল কথা করিবি নানাখানা... [২৩]

গানটির বাণীতে যে মর্ম উদ্ভাসিত হয়েছে তা কোনো আত্মদ্বন্দ্বে ভোগা মানুষের জন্যেই বলা। দ্বিধাদ্বন্দ্বের পিছুটানকে ছিন্ন করে স্বদেশের জন্যে আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব জাগ্রত করার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে এ গানটিতে। কবি সেই মানুষকে বলছেন " যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না।" অর্থাৎ কেউ অন্ধ আবেগের বসে নয় বরং হৃদয়ের তাড়না থেকে স্বদেশের নিমিত্তে নিজেকে সমর্পন করার মাঝেই রয়েছে স্বার্থকতা। লক্ষ্য অর্জনের জন্য একাগ্রতা এবং মুক্তি অর্জনের জন্য ভাবনা স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে কবি প্রথম লাইনের মতো আরো কিছু শব্দের অবতারণার মধ্যদিয়ে গানটির ভাব-চিত্র নির্মাণ করেছেন। যেমন যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে/ যদি তোর হাত কাঁপে/ যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাহে মন /তবে তুই সইতে কভু পারবি নে ইত্যাদি একই ভাবের বাণীর মধ্যদিয়ে শক্তিশালী ছন্দময়তার মাধ্যমে গান নির্মাণ করেছেন। গানটির ভাষা সহজ সাবলীল; এখানে জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার নেই বরং সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ঝর্ণার মতো প্রবাহমান শব্দের ব্যবহারে প্রকাশশৈলী বোধগম্য হয়ে উঠেছে।

৩.১.৪ গান নং ১৩

ওরে, নূতন যুগের ভোরে

ওরে, নূতন যুগের ভোরে
দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে॥
কী রবে আর কী রবে না, কী হবে আর কী হবে না
ওরে হিসাবি,
এ সংশয়ের মাঝে কি তোর ভাবনা মিশাবি?।
যেমন করে ঝর্না নামে দুর্গম পর্বতে
নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড় অজানিতের পথে।
জাগবে ততই শক্তি যতই হানবে তোরে মানা,
অজানাকে বশ করে তুই করবি আপন জানা।
চলায় চলায় বাজবে জয়ের ভেরী
পায়ের বেগেই পথ কেটে যায়, করিস নে আর দেরি... [২৪]

আমাদের বর্তমান বিশ্লেষিত গানটিতে আত্মচেতনার যে মন্ত্র আমরা অনুভব করি এই গানটি যেন তারই ধারাবাহিক রূপচিত্র। 'ওরে, নূতন যুগের ভোরে' ভোরে শব্দটির মধ্যমে কবি বর্তমানের সঠিক সময়কে অনুভব করেছেন। আর এই সময়কে বৃথা অপচয় না করে ভবিষ্যতের ভাবনা না-ভেবে সংশয় কাটিয়ে যেতে বলেছেন মুক্তির পথে। তাই তো তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলছেন "এ সংশয়ের মাঝে কি তোর ভাবনা মিশাবি?" কবি

গানটিতে স্বাধীনতার জন্যে ঝর্ণার মতো ঝাঁপ দিতে বলেছেন। কর্মপথের শেষে জয়ের মুকুট ছিনেয়ে আনার মাধ্যমেই পথের যাত্রা সফল করার আহ্বান করেছেন। গানটির বাণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গানের শুরু এবং শেষে পরাধীন জাতিকে এগিয়ে যাওয়ার তাগাদা দিয়েছেন।

৩.১.৫ গান নং ১৪

ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি

ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি,
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী ॥
মরিস মিথ্যে ব'কে ঝ'কে, দেখে কেবল হাসে লোকে,
না হয় নিয়ে আপন মনের আগুন মনে মনেই জ্বললি ॥
অন্তরে তোর আছে কী যে নেই রটালি নিজে নিজে,
না হয় বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে চুপেচাপেই চললি ॥
কাজ থাকে তো কর্ গে না কাজ, লাজ থাকে তো ঘুচা গে লাজ,
ওরে, কে যে তোরে কী বলেছে নেই বা তাতে টললি...[২৫]

গানটি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের মধ্যে খুব বেশি জনপ্রিয় নয়। তবে গানটি বিশ্লেষণ করলে বাণীর বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্যতা দেখা যায়। ভাব সরল হলেও প্রকাশশৈলী তেমন সরল নয়। বাণী আর শব্দব্যঞ্জনার দিকেও কিছু কথা ছুঁড়ে দিয়েছেন, পরাধীন জাতির উপর। অর্থাৎ আপন মনের স্বদেশ ভাবনাকে শক্তিতে রূপায়িত করে কর্মের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি বিশ্লেষিত গানের প্রাণবস্তু। গানটিতে কথায় কথায় সময় ক্ষেপণ না করে অন্তরের আগুন বাইরে না রটিয়ে মুক্তির পথে চলার পরামর্শ রয়েছে। স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় যে পরের কথায় না টলে নিজের লক্ষ্যে সফল হবার প্রেরণা রয়েছে গানটির বাণীতে ।

৩.১.৬ গান নং ১৫

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই!

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই!
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই॥
একটা কিছু করে নে ঠিক, ভেসে ফেরা মরার অধিক
বারেক এ দিক বারেক ও দিক, এ খেলা আর খেলিস নে ভাই॥
মেলে কিনা মেলে রতন করতে তবু হবে যতন
না যদি হয় মনের মতন চোখের জলটা ফেলিস নে ভাই!
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিস নে আর হেলাফেলা
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা তখন আঁখি মেলিস নে ভাই॥ [২৬]

এ গানটি আত্মউদ্দীপনামূলক গানের সুন্দর ও সার্থক উদাহরণ । এখানে প্রকাশ পেয়েছে আত্মউদ্দীপনার চরম রূপ। গানটির প্রথম পংক্তিতে দেখা যায় যে কবি বলছেন "বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই!" অর্থাৎ নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ শক্তিসঞ্চয় করে সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে কর্মফলের ভাবনা না ভেবে দেশের জন্য এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এ গানটিতে। সময় বয়ে যাওয়ার আগেই সমস্ত প্রস্তুতি সাঙ্গ করে স্বদেশের স্বাধীনতা সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে নিজেকে স্থির করার বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেছেন এ গানে। গানটি ব্যাখ্যা করলে আরো পরিলক্ষিত হয় যে গানটি আত্মউদ্দীপনামূলক গান হলেও বাণীতে প্রেরণার উপাদান নিহিত রয়েছে। গানটির শেষ দুই পংক্তিতে তা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। "ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিস নে আর হেলাফেলা/ পেরিয়ে যখন যাবে বেলা তখন আঁখি মেলিস নে ভাই" ।

৩.২ ঐক্য উদ্দীপনামূলক গান

৩.২.১ গান নং- ১৬

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী॥

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী॥
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে, ভাই, ডাক দে আজি
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল সব দড়াদড়ি॥
দিনে দিনে বাড়ল দেনা, ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা
হাতে নাই রে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন করে
ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি॥ [২৭]

'মন মাঝি সামাল সামাল, ডুবলো তরী, ভব নদীর তুফান ভারি' গানটি ভারতীয় উপমহাদেশের শতবছরের ঐতিহ্যের ভাবদর্শনে সারি অঙ্গের গানের অনুপ্রেরণায় বিণির্মিত হয়েছে। এখানে মরা গাঙে বান বলতে প্রতীকী অর্থে আশার আলোকে ইঙ্গিত করেছেন। অপরদিকে জয় মা বলে সেই মরা গাঙে তরী ভাসানোর আহ্বান করেছেন। কবি এখানে ভারতীয় পুরাণের মা দুর্গার শক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। অপর ব্যাখ্যায় মা বলতে দেশমাতৃকাকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ সমালোচকদের ভাষায় বলা যায়, 'নিপুণভাবে ব্যবহৃত শব্দ আসলে চিন্তারই প্রতিফলিত আলো'[২৮]। এখানে উক্ত গানের রচয়িতা সূক্ষ্ম চিন্তার সচেতন অর্থব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগে শৈল্পীক

প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গানটির তৃতীয় লাইনে গীতিকার বলেছেন "তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে" এখানে তরীর বৈঠা বলতে গীতিকার গভীরভাবে অস্ত্র হিসেবে নির্দেশ করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে গানটিতে প্রতীকীবাদের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। আর তাই বলা যায় যে, 'প্রতীকভাব একেবারে স্পষ্ট বা খোলামেলা হতে পারে না; কিছুটা আলো-আঁধারির খেলা থাকবে প্রতীকবাদের মধ্যে। কিছুটা দেখা কিছুটা অদেখা। আভা-আভাসের ইঙ্গিত। এই সবের মধ্যদিয়েই বুঝে নিতে হবে সবটা, একেবারেই সৃষ্টি হবে প্রতীকের দ্যোতনায়"[২৯] তবে প্রতীকিবাদীরা মনে করেন এখানে কোনো বিষয় স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্ত গান তার অনেকটা বিপরীত। গানটির সুর আর ভাষাশৈলীর দিকে দৃষ্টি দিলে ঠিকই বোঝা যাবে যে গানটিতে যা নির্দেশ করেছেন তা মূলত অনুভূতিজাত। এ গানের বিখ্যাত একটি লাইন 'দিনে দিনে বাড়ল দেনা' যে লাইনটি বাঙালি নানা সংকটে ব্যবহার করে থাকেন। গানটির শেষ লাইন 'যা হয় হবে বাঁচি মরি' কথাটিতে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে বরণ করে চলার আহ্বান করেছেন। অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্যে নিজের জীবন অকাতরে বিলিয়ে দেবার কথা ব্যক্ত করেছেন। হয় বাচঁবো নয় মরবো এই পণ করে দেশমাতৃকাকে বাঁচানোর জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মূলত গানটিতে গাঙে নতুন জোয়ার এলে যেমন আল্লাহ খোদার নাম নিয়ে মাঝি মল্লারা বেরিয়ে পড়ে তেমনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ই যে গতি এসেছিল বাঙালির চিত্তে সেই গতিতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার সূক্ষ্ম বাসনাও দৃষ্টি এড়ায় না।

৩.২.২ গান নং- ১৭

নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।

নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন, হবেই হবে ॥
পাষাণসমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে ॥
সময় হল, সময় হল-- যে যার আপন বোঝা তোলো রে--
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে দেখবি সবাই আসবে সেজে--
এক সাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে॥ [৩০]

এ গানের কথাগুলি সুনির্দিষ্টভাবে উপলব্ধি করলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনা সম্পর্কে। আর সুরারোপের জন্য তিনি বাউলের সাথে শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে বিভাস রাগের আশ্রয় নিয়েছেন। এ গানের প্রথম

লাইনেই বলেছেন "নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।/যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।/ওরে মন, হবেই হবে ॥" অর্থাৎ গানটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের আশা ও পণকে স্থির রাখার কথা বলেছেন। কবি নিজেও তা সত্যরূপে উপলব্ধি করেছেন, তাই তিনি বলেছেন 'আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে'। সত্য এবং বিশ্বাসের অনন্য শক্তি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি জীবনে বলেছেন "জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচারণ করা যায়। কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলিনে– সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের এক মাত্র আশ্রয় স্থান"[৩১] উক্ত গানটিতে বেশকিছু শব্দের অবতারণা করেছেন যেমন : রবেই রবে, কবেই কবে, সবেই সবে, লবেই লবে। ব্যাকরণগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে সরাসরি বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে শব্দগুলোর দ্বারা গীতিকার সাফল্যের একটা নিশ্চিত সমাপ্তি টানতে চেয়েছেন। আর বুঝাতে চেয়েছেন আমাদের সাফল্য আমাদের কর্মেই নিহিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> "Things are distinct not in their essence but, in their appearance; in other world in, their relation to one to whom they appear. This is art, the truth of which is not in substance or logic but in expression" অথৎ শিল্পীর চোখে বস্তুর যে রূপটা ধরা প'ড়ে শিল্পে প্রতিভাত হয়, শিল্পী যে রূপটিকে প্রকাশ করেন সেটা হ'ল সত্যরূপ। এই রূপের রমনীয়তা নির্ভর করে তার প্রকাশের ওপর। সুতরাং প্রকাশটাই মূখ্য। [৩২]

উক্ত গানের প্রকাশশৈলীতে গীতিকারের মনের অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে উপরের উদাহরণের মতোই। পরিশেষে বলা যায়, মশাল থেকে মশালে আগুন দেওয়ার মতো প্রতি প্রাণ থেকে প্রাণের জাগরণের মন্ত্র পুরে দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লক্ষ্যে সফল হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন উক্ত গানটিতে।

৩.২.৩ গান নং- ১৮

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে? ॥
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় বলে ঐ ডেকেছে কে,
সেই গভীর স্বরে উদাস করে আর কে কারে ধরে রাখে? ॥
যেথায় থাকি যে যেখানে বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,

সেই প্রাণের টানে টেনে আনে সেই প্রাণের বেদন জানে না কে?।
মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে
সেই নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখো॥
কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মাকে॥ [৩৩]

বর্তমান বিশ্লেষিত গানটি মূলত রামপ্রসাদী সুরের উপর কথা বসিয়ে বিনির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য বাংলা সংগীত আঙ্গিনায় শক্তিমান অনেক গীতিকার রামপ্রসাদী সুরে গান সৃষ্টি করেছেন। কারণ সুরটি অত্যন্ত সরল অথচ আকর্ষণীয়। আজও এর সরল সহজ সুরের জন্যে গানটি শ্রোতাদের চিত্তকে নাড়া দেয়। ফলে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক অভিব্যক্তির ছোঁয়ায় স্বদেশ পর্যায়ের এই গানটি অনন্য মাত্রা পেয়েছে। এর বাণী পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় এখানে গীতিকার অন্যসব গানে যেমন আপনি, আমি, তোরা শব্দ ব্যবহার করেছেন এখানে শুরুতেই আমরা শব্দটি ব্যবহারের মধ্যেদিয়ে একটি যৌগিক মিলন ঘটিয়েছেন। বলেছেন "মিলেছি আজ মায়ের ডাকে"। ঘরের হয়ে পরের মতন বাক্যের মধ্যদিয়ে গীতিকার পরাধীনতার রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। আর হৃদয় মাঝ থেকে মুক্তির ডাক শোনার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে একত্রে মিলিত হওয়ার আহ্বান রয়েছে। গানে নিজের প্রাণেই বার বার গভীর স্বরে ডেকে উঠছে চলে আয়। গানের বাণীতে প্রাণের টানে কথাটা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে চমৎকার একটা দর্শন অঙ্কিত হয়েছে। আর প্রাণের টানের সাথে, আমরা, সবাই মিলে, ভাই শব্দ প্রয়োগে অভিন্ন এক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। 'সেই নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখো॥' গানটি আরো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসন করে দেশের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় একত্রিত হয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকলকে এক হয়ে স্বদেশের জন্য সম্মিলনের আহ্বানই হলো এই গানের মর্মকথা। দৈন্যতা, গ্লানি মুছে দিয়ে নতুন আনন্দে স্বদেশের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রকাশের ভিতর দিয়ে শেষ হয়েছে গানটি।

৩.২.৪ গান নং- ১৯

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।
আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তাঁর খুশিতেই চরি,

আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।
রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো ক'রে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?
আমরা চলব আপন মতে, শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?। [৩৪]

বর্তমানে প্রচলিত নানা উৎসব অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের এ গানটি সাধারণত শিশু কিশোরদের গাইতে দেখা গেলেও গানের মর্মবাণী সকল শ্রেণির মানুষের জন্য প্রাসঙ্গিক। এ গানটি প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "রাজা' ও পরবর্তীতে 'অরূপরতন' (রাজার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) নাটকেও ব্যবহার করেন। কিছু কিছু গবেষকদের মতে গানটিতে কবি রাজত্বের আদর্শগুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার অনেক গবেষক মনে করেন গানটিতে সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক চেতনার আভাস বিদ্যমান। তাই কবি বলেছেন "আমরা সবাই রাজা"। অর্থাৎ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে কর্তৃত্ববাদী সমাজব্যবস্থায় নিপীড়ণমূলক শ্রমচক্রের প্রজা শ্রেণির মানুষের মুক্তির অভিলাসে রাজা বলা হয়েছে। রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক এখানে স্বার্থসাপেক্ষের নিরিখে একে অপরের সাথে পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল।

এ গানের পরবর্তী লাইনে কবি বলেছেন "নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?" এখানে 'স্বত্বে' শব্দটি শর্তে ন্যায় অধিকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় যে দৃশ্যকল্প এঁকেছেন সেই দেশের মানুষ শুধু কর্মচরিত্রের পরিচয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তার কর্মের মধ্যেই আপন চিত্তে মুক্ত-স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। আমরা সবাই রাজা আর এই রাজার সঙ্গে সম্পর্কটি ত্রাসের বা দাসত্বের না। অতএব আমরা সবাই রাজা কথাটি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজাকেই ইংগিত করে না; রাজা বলতে সকল শ্রেণির মানুষের আপনচিত্তের স্বাধীন চেতনাকে প্রকাশ করে।

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে/ নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?" এ বাক্যে আমরা বলতে নিজেকে সবাইকে রাজার সাথে তুলনা করেছেন। অপর বাক্যে "আমরা যা খুশি তাই করি,/তবু তাঁর খুশিতেই চরি" সবাই রাজা সবাই স্বাধীন তবে স্বাধীনতা মানে যথেচ্ছাচার নয়। আমার যা কিছুই করি না কেন শেষ পর্যন্ত রাজা অর্থাৎ ঈশ্বরের খুশিতেই আমার খুশি। তাঁর জোর করে চাপিয়ে দেয়া নির্দেশ আমরা মানবো না। তবে স্বাধীনভাবে তার নির্দেশনা মেনে চলতে কোনো আপত্তি নেই।

৩.২.৫ গান নং- ২০

আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার

আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।
তোমাওে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর--
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার--
তোমারে করি নমস্কার॥...[৩৫]

"আমাদের যাত্রা হল শুরু..." এটি রবীন্দ্র স্বদেশ সাধনার অন্যতম জনপ্রিয় গান। শুধু গানেই নয় এ গানের বাণী বাঙালি তাদের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করে থাকে। এ গানটিতে কবি স্বদেশের জন্যে আত্মপ্রাণ উৎস্বর্গ করার কথাই ব্যাক্ত করেছেন। এ যাত্রার শুরু হৃদয়ের নিভৃত থেকে, এ যাত্রাপথে যদি বাতাস ছুটে, তুফান উঠে কেউ পিছু হটবে না; এ মন্ত্র নিয়ে সবাই এগিয়ে যাওয়ার পণ করেছে। গানটির বাণী-সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মোট ৬ বার 'তোমারে করি নমস্কার' আবার ঠিক ৬বার ব্যবহার করেছেন 'ওগো কর্ণধার' শব্দটি। এর মাধ্যমে গানের বাণীতে নব ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ওগো কর্ণধার-ই মূখ্য কর্ণধার-ই গানের কর্তা (subject)। গানটিতে স্বদেশী আন্দোলনের চেয়ে একত্রিকরণের একটা ভাবব্যঞ্চনা ব্যঞ্জিত হয়েছে। একদিকে যেমন সর্বসাধারণের জাগরণের ঢেউ অন্যদিকে এই জাগরণের কর্ণধারের প্রতি শ্রদ্ধা ভরে অভিবাদন জানানোর মাধ্যমে গানটি রচিত হয়েছে। কবিগুরুর স্বদেশ পর্যায়ের এ গানটির গঠনশৈলীর দিক থেকে বড় হলেও সমকালীন একবিংশ শতাব্দিতে গানটির প্রাসঙ্গিকতার জন্যে বিভিন্ন সময়ে গাওয়া হয়ে থাকে।

৩.২.৬ গান নং- ২১

এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো।

এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-স্বর্গ॥
ওরে ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুলল দুয়ার মন্দিরে যে
লগ্ন বয়ে যায় পাছে, ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য?।
এখন যার যা-কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালার পরে,

আত্মদানের উৎস ধারায় মঙ্গলঘট ভর্ গো।
আজ নিতেও হবে, আজ দিতেও হবে, দেরি কেন করিস তবে
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মরতে হয় তো মর্ গো॥ [৩৬]

আত্মদানের উদ্দেশ্যে মঙ্গলঘট স্থাপনের মতো শক্তিশালী আহ্বানের মাধ্যমে স্বদেশের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে স্বদেশ পর্যায়ের এ গানটিতে। তবে ঐক্যউদ্দিপনার এই গানটিতে বাণী-বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনা তেমন লক্ষ্য করা যায় না। কেননা এইরূপ ভাব রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে খুঁজে পাওয়া যায়। হয়তো এটাই কবির স্বরূপ। গানের প্রথম লাইনে বলছেন 'এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো' অর্থাৎ সবাইকে একত্রিত হয়ে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এই বন্ধনই মিলন-স্বর্গের দিকে নিয়ে যাবে। বাণীতে মিলন-স্বর্গ হিসেবে কবি স্বাধীনতাকেই বুঝিয়েছেন, প্রতীকি অর্থে বুঝিয়েছেন একত্রিত হয়ে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার কথা। পরবর্তী লাইনে যে সব শব্দ লক্ষ্য করা যায় অনুরূপ এমন শব্দ রবীন্দ্রনাথের বেশকিছু গানে লক্ষ্যণীয়। যেমন শঙ্খ, মন্দির, পূজার অর্ঘ্য ইত্যাদি। জাতিকে পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সাথে পরাধীনতার বেড়া থেকে মুক্ত হতে আহ্বান জানিয়ে পরবর্তী লাইনের অবতারণা। সে লাইনগুলোতে ঐক্য গড়ে তুলতে পবিত্রতার আশ্রয় নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা, অগণতান্ত্রিকতা ও সহিংসতার বিরূদ্ধে লড়াই করতে বলেছেন। সমস্ত আয়োজন পরিপূর্ণ করে, সমস্ত দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে জীবন- সমর বাজি রেখে পেছনের সব পথ বন্ধ করে একমাত্র স্বদেশকে মুক্তির আলোয় আলোকিত করতে আহ্বান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এ গানের শেষ লাইন "বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মরতে হয় তো মর্ গো॥"-এতে আরো সুসম্পষ্ট হয়ে উঠে স্বাধীনতাই মূখ্য, স্বাধীনতাই জীবন।

৩ প্রেরণামূলক গান

রবীন্দ্র সাধনার এই পর্যায়ের গানগুলো প্রেরণামূলক শিরোনামে লিপিবদ্ধ করার কারণ হলো; গানগুলোতে জীবনবোধের সত্য-সন্ধানের ভাব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের একটি বড় অংশ এই প্রেরণার ভিত্তি হিসেবে নিহিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রেরণামূলত গানের মূল উৎস হিসেবে দেখা যায় আর্দশ দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বেদনা ও স্বপ্ন চেতনা প্রভৃতি। এই পর্যায়ের গানগুলোর মধ্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে লক্ষ্য করা যায়- 'যে তোরে পাগল বলে', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ', 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে', 'আমি ভয় করব না' ও 'আপনি অবশ হলি' ইত্যাদি।

ক্রমিক নং	গান	সংখ্যা	রচনাকাল	প্রকাশসাল
১.	যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।	৩নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
২.	তোর আপন জনে ছাড়বে তুওে	৪নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৩.	আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?	৮নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৪.	যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু॥	২৬ নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৫.	খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে	৪৫ নং	২২ আশ্বিন ১২৯৯ ৭ অক্টোবর ১৮৯২	
৬.	সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান	১১ নং	পৌষ ১৩৩৬ ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৯২৯-১৯৩০	
৭.	ঘরে মুখে মলিন দেখে	৩১নং		
৮.	নাই নাই ভয়	১২ নং	১লা আশ্বিন ১৮সেপ্টেম্বর ১৯২৬	
৯.	ছি ছি চোখের জলে	৩০নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

৪.১ গান নং- ২২

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়--
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ॥[৩৭]

উপরিযুক্ত গানটি রবীন্দ্রনাথের বাউল অঙ্গের দাদরা তালে নিবদ্ধ গানগুলোর মধ্যে অন্যতম। গানটি তিনি "হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে আমার একলা নিতাই" নামক একটি জনপ্রিয় মনোহরশাহি ঘরানার বাংলা ধাপকীর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচনা করেন। এ গানের মর্মার্থে দেখা যায় আপন চিত্তকে দমে না যাওয়ার বিশেষ অনুপ্রেরণা। কবি এখানে সত্য সন্ধানের পথে আপন কর্মের সাথী হতে কেউ না আসলেও একলা চলার তাগিদ দিয়েছেন। স্বপ্নসোপানের পথ যতই কঠিন হোক না কেন সে পথে হাসিমুখে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পরাধীন জীবনের অতৃপ্ত বাসনায় কাতর কবি নিজেও। পরাধীন জীবনে সত্য ও সুন্দরের পথে সংগ্রামী হওয়াই পরমতৃপ্তির। যে স্বাধীনতাবোধ গভীর হৃদয় থেকে ভেসে আসে। তাই কবির এই তীক্ষ্ণ আহ্বান যেন নব্য জাগরণ তৈরি করে। এ গানটি তৎকালীন সমাজবাস্তবতায় পরাধীন জীবনে বিচিত্র সত্যের নানা অবয়বে ধারণ করার প্রয়াসী করে তুলে। জীবনকে গভীর এবং নিবিড়ভাবে অনুধাবণ করতে শেখায়। গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্মভাবে তাঁর পাঠক ও শ্রোতাদের জীবনকে উপলব্ধি করার ও তাগিদ দেয়ার নিমিত্তে গানটি রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মানুষকে তাঁর জীবনের কঠিন মুহূর্তে নানাভাবে পেরিয়ে আসার পথ দেখিয়েছেন। তাকে অভাগা '(অভাগা [abhāgā] বিণ. বি. ভাগ্যহীন, হতভাগ্য; করুণার যোগ্য [সং. অভাগ্য]। বিণ. বি. স্ত্রী. অভাগী, অভাগিনী।)'[৩৮] বলে সাব্যস্ত করছেন। কবি জানতেন চারপাশের জীবন থেকে পলায়ন করার কোনো পথ নেই এখানে স্বাধীনতাই একমাত্র পথ। স্বাধীনতাকামী মানুষের পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতার পথ বেছে নেয়া কোনো স্বপ্ন নয়; বরং সংগ্রামের সাথী হওয়া। যা এ গানের বাণীর পরতে পরতে প্রকাশিত হয়।

৪.২ গান নং- ২৩

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না॥...[৩৯]

বিশ্ব মানব ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিকদের মহান ত্যাগের বিনিময়ে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের বাণী বিশ্লেষণ করলে সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হয় যে, পরাধীন মানবকে স্বাধীনতা পেতে কীভাবে তার পথ চলতে ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। গীতিকার তাঁর প্রত্যাশিত আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন তাঁর গীতবাণীতে। পরাধীন থেকে স্বাধীনতা পাবার উদ্দেশ্যের যাত্রাপথ এত সহজ নয়। অর্থাৎ স্বদেশের মুক্তির পথ যত বন্ধুর-ই হোক না কেনো তবুও এগিয়ে যাওয়ার শক্তি অন্তরে ধারণ করার আহ্বান রয়েছে গানটিতে । তোমার সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে, তোমার আপনজন ছেড়ে দেবে/ আশালতা ছিড়ে যাবে (বাংলা আভিধানিক অর্থে আশালতা শব্দটির কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় যে, আশা+লতা অর্থাৎ আশালতা)। পথে আঁধার নেমে আসবে/ বাতি নিভে যাবে/মুখের বাণীতে কেউ সাড়া দেবে না অর্থাৎ একজন স্বাধীনতাকামী মুক্তিপাগল ব্যক্তি এই ধরনের নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এর জন্যে গীতিকার সঠিক পথগুলো দেখানোর সাথে সাথে হতাশ না হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। বলা হয়ে থাকে মানুষের সুন্দর বাণী রত্নের চেয়েও মূল্যবান। গানটির মধ্যদিয়ে চমৎকার অনুপ্রেরণামূলক উক্তি দুর্বলকে যোগায় শক্তি, দিশেহারাকে দিশা দেখায়। বাণীগুলো যে শুধু তৎকালীন সময়েই প্রাসঙ্গিক তা নয় সর্বকালে শত সংকটে হতাশাবাদীদের আলো দেখাবে। স্বদেশের জন্য নিবেদিত প্রাণে বৈরিতা ও কন্টকই উপস্থিত হোক তবুও হেলে না পড়ার জন্য বলা হয়েছে গানের প্রতিটি বাণীতে। আর বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য পদে-পদে ব্যর্থ হলেও বারবার জয়ের প্রচেষ্টার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে গানটি শেষ করা হয়।

৪.৩ গান নং- ২৪

আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?

আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে॥
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়, আপনাকে তুই করে নে জয়
সবাই তখন সাড়া দেবে ডাক দিবি তুই যারে॥
বাহির যদি হলি পথে ফিরিস নে আর কোনোমতে,
থেকে থেকে পিছন-পানে চাস নে বারে বারে।
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে, ভয় শুধু তোর নিজের মনে
অভয়চরণ শরণ করে বাহির হয়ে যা রে॥ [৪০]

রবীন্দ্রসংগীতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তা একাধারে যেমন গলায় বাঁধা যায় অনুরূপভাবে তা পাঠযোগ্যও। গানটির বাণী-সৌন্দর্য্যের বিচারে নাতিদীর্ঘ বয়ানে ব্যক্ত তা বলাবহুল্য। রবীন্দ্রনাথের উক্ত গানে দর্শনের সাথে যে বাকপটুতার অর্থাৎ কাব্যগুণ বির্নিমিত হয়েছে তা সত্যিকার অর্থেই প্রসংসার দাবি রাখে। বর্তমান বিশ্লেষিত গানের মধ্যদিয়ে যে রূপ চিত্রিত হয়েছে তাতে তিনি একজন যোদ্ধাকে উদ্দেশ্য করে প্রেরণা দিয়েছেন। কবির এই গানটি অভ্যন্তরীন ভাববৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিশ্লেষণ করে বলা যায়, আত্মশক্তির বলে অন্যের মনের শক্তি যোগানো এবং নিজেকে স্বদেশের জন্য প্রস্তুত করে অন্যদেরকে স্বদেশের পথে আনার বিষয়টি এই গানের প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাই তো তিনি বলেছেন "আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে? উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে॥" এখানে নিজেকে অবশ না হওয়ার জন্য বলেছেন। হয়তো এখানে গীতিকারের নিজের মানসিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর যদি তাই হয় তাহলে তিনি তাঁর আবেগের প্রবলতা প্রকাশ করেছেন সৌন্দর্য্যের উপকরণ দিয়ে। একজন ব্যক্তি জীবনে কী করতে সক্ষম তা তার বিশ্বাস ও প্রত্যাশার ওপর নির্ভর করে। গানে কবি বলেছেন "বাহির যদি হলি পথে ফিরিস নে আর কোনোমতে/ থেকে থেকে পিছন-পানে চাস নে বারে বারে। অর্থাৎ পথ চলতে যদি মনে কোনো দ্বিধা থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তি নিজের ছায়াকেও দেখে ভয় পাবে। তাই তিনি উক্ত বাণীর মধ্যদিয়ে লক্ষ্য স্থির রেখে আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথাই ব্যক্ত করেছেন। গানটির শেষের দিকে চমৎকার বাণীর সংযোজনে গীতিকার বলেছেন "নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে, ভয় শুধু তোর নিজের মনে" এখানে ত্রিভুবনে শব্দের মধ্যদিয়ে গীতিকার জীবন সংগ্রামের যে প্রতিচ্ছবি অংকন করেছেন তা সচেতন স্বদেশ-ভাবনার দর্শন আরো প্রসারিত করে। রবীন্দ্রনাথ উক্ত গানের ভিতরে নিজের অন্তরে আলো জ্বালিয়ে সে আলোয় অন্যকে উজ্জ্বল করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

যা শিল্প বিচারে গীতিকারের অন্যসব গানের মতো শিল্পমান উত্তীর্ণ করেছেন বলে বোধ করি। কেননা গীতের যে কাব্যময়তা লক্ষ্য করা যায়, তাতে বাক্য গঠনে অভিনব আবেগ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করে।

৪.৪ গান নং- ২৫

আমি ভয় করব না ভয় করব না।

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না॥
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে
সহজ পথে চলব ভবে পড়ব না, পাঁকের পরে পড়ব না॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না॥ [৪১]

স্বদেশের পথে চলতে গিয়ে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে জয় করার প্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে উক্ত গানের বাণীতে। অর্থাৎ জীবন কখনো নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের নয় আবার সুখের নয়। জীবনের যেকোনো সময় দুঃখ, বাধা, বিপদ, এমন কি মৃত্যুর মতো কঠিন কিছু এসে সামনে দাঁড়াতে পারে। আর তাই সব সময় নির্ভয় চিত্তে সকল বাধা অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের কাজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর এ গানের মূলবক্তব্য বিশ্লেষণ করলে তাই প্রতীয়মান হয়। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে যে, শান্ত নদীতে কখনোই দক্ষ নাবিক হওয়া সম্ভব নয়। কেননা শান্ত নদীতে একজন সাধারণ নাবিকও নৌকা চালাতে পারে। উক্ত প্রবাদের সাথে রবীন্দ্রনাথের এ গানটি প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন "তরী বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে/ তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না"॥ মৃত্যু ভীরু দুর্বল মানুষের জীবনে অহরহ ঘটে চলেছে। জীবনকে যদি তরী বা নৌকার সঙ্গে তুলনা করা যায়, বিঘ্ন-বাধাকে যদি সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে উপমিত করা যায় এবং মানুষকে যদি সেই তরী বা নৌকার কাণ্ডারীরূপে কল্পনা করা যায়, তবে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র অভিযানকে জীবনযুদ্ধের প্রতিরূপ ভাবা যেতে পারে। দুঃখজয়ী, বিঘ্নবিপদে অচঞ্চল মানুষই তো মহত্ত্বের চিরবাঞ্ছিত আসনে প্রতিষ্ঠালাভ করে। সে-ই মানুষ নামের যোগ্যতম অধিকারী। কবি এখানে আরো বলেছেন নিজ ধর্ম মাথায় রেখে (এখানে ধর্মকে নিজের কর্ম বলে বুঝিয়েছেন যেমন নাবিকের ধর্ম তরী পরিচালনা করা) সরল পথ অনুসরণের জন্য আহ্বান করেছেন। তবে বিপদ আসলে নিজের কর্মের পাশাপাশি শক্ত হাতে তা

প্রতিহত করতে হবে। পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে শত্রুর জাল সহজ ভেবে তার মধ্যে বাঁধা না পড়ার এবং উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ঘরের কোণে বসে না থাকার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে গানটির বাণীতে।

৪.৫ গান নং- ২৬

যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু॥

যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু॥
আজকে তোরে কেমন ভেবে অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে আসবে রে তোর পিছু-পিছু॥
আজকে আপন মানের ভরে থাক সে বসে গদিরপরে
কালকে প্রেমে আসবে নেমে, করবে সে তার মাথা নিচু॥... [৪২]

স্বদেশের মুক্তির নেশায় মত্ত দেশপ্রেমিকের কর্মপথে উপহাস বিদ্রুপ ইত্যাদি বিষয় তুচ্ছ করে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেখা যায় গানের বাণীতে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের সৃষ্টিশৈলীর মধ্যে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে প্রেরণা। বর্তমান বিশ্লেষিত গানেও তেমনি প্রেরণার আভাস উজ্জ্বল হয়ে আছে। নাতিদীর্ঘ গানটিতে কবি কোনো ব্যক্তি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বললেও এই ব্যক্তি যেন লক্ষ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তাই তিনি বলছেন 'যে তোরে পাগল বলে তারে তারে তুই বলিসনে কিছু' এই তোরে সাধারণ অর্থেই সকল মানুষ। যে মানুষগুলো হয়তো হতাশাগ্রস্ত নয়তো পরের কথায় খানিকটা দুর্বল। তাই কবি নীরব চিত্তে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি জানেন যে, যে লোকগুলো পিছন থেকে কথা বলে সেই লোকগুলাই প্রাতে মালা হাতে আসবে তাই তিনি বলছেন ' কাল সে প্রাতে মালা হাতে আসবে রে তোর পিছু-পিছু॥' মাত্র পাঁচ লাইনের এ গানের প্রথম অন্তরায় যে ভাব উদ্ভাসিত হয়েছে; ঠিক শেষ অন্তরায় একই ভাব স্ফুরিত হয়েছে। বলাবহুল্য বাণীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আলাদা বাণী ব্যবহৃত হয়েছে।

৪ মাতৃবন্দনা মূলক গান

মাতৃবন্দনার সন্ধিবিচ্ছেদ হলো মাতৃ+বন্দনা। অর্থাৎ মাতৃভূমির গুণকীর্তনমূলক গানকেই সাধারণত মাতৃবন্দনামূলক গান হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ ধারার গানের মূল উপাদান স্বদেশের রূপলীলার বন্দনা, স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা এবং মাতৃভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। গানগুলোর মধ্যে রয়েছে 'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে', 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, 'হে মোর চিত্ত', 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে', 'এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু', 'জননীর দ্বারে আজি ঐ' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ গানগুলো সকল শ্রেণির মানুষকে মাতৃভূমির প্রতি গভীরভাবে অনুরাগী করে তোলে। সযত্নে মাতৃভূমির জন্য সচেতন শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার সরল যোগাযোগ তৈরি করে। জাতি, ধর্ম ও শ্রেণি বৈষম্যের ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে মাতৃভূমিকে নতুনভাবে ভালোবাসতে ও উপলব্ধি করতে শেখায়।

ক্রমিক নং	গান	সংখ্যা	রচনাকাল	প্রকাশসাল
১.	এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ	৩৫নং		ফাল্গুন ১৩০৯ ফেব্রুয়ারি- মার্চ ১৯০৩
২.	হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে	১৫নং	১৮ আষাঢ় ১৩১৭ ২ জুলাই ১৯১	
৩.	দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী	১৬নং		ভাদু ১৩২৪ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯১৭
৪.	জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে।	৩৭নং	১৩১০ ১৯০৩-০৪	

৫.	জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!	১৪নং	১২ পৌষ ১৩১৮ ২৮ ডিসেম্বর ১৯১১	
৬.	বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল	২০ নং		কার্তিক ১৩১২ অক্টোবর ১৯০৫
৭.	সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে	২৪নং		আশ্বিন ১৩১২ অক্টোবর ১৯০৫
৮.	যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা	২৫ নং		৬ আশ্বিন ১৩১২ ২২সেপ্টেম্বর ১৯০৫

৫.১ গান-২৭
এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ--

এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ--
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা ॥
অনির্বাণ ধর্ম আলো সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দিনে হে,
রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে ॥
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম তব নির্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে ॥ [৪৩]

স্বদেশের গুণকীর্তনে 'গান' শৈল্পীক মাত্রা বহন করে। কেননা গানের বাণী, ভাব, সুর ও ছন্দের ঐক্যতানে স্বদেশের রূপবৈচিত্র্য যতটা আর্কষণীয় হয়ে উঠে শিল্পের অন্য কোনো মাধ্যমে ততটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেনা। রবীন্দ্রনাথের মাতৃবন্দনামূলক গানগুলোর মধ্যে উপরিযুক্ত গানটি অন্যতম। এ গানটির বাণী অর্থব্যঞ্জির গভীরতার সাথে সুর ও ছন্দের নিবিড় বন্ধনে আশ্চর্য এক শৈলী তৈরি করেছে। এ গানের বাণীতে লক্ষ্য করা

যায়, ভারত মাতাকে সুন্দর রাখার জন্যে প্রভুর কাছে কবির আকুল আকুতি। এ শুধু আকুতিই নয় বরং এক প্রার্থনা, যে প্রার্থনা ব্যক্তির নয় ভারবর্ষের সমষ্টিক আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথ প্রথম চরণে প্রার্থনা করেছেন এ ভারতবর্ষে প্রভূর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। তিনি আরও প্রার্থনা করেছেন সৃষ্টিকর্তার অভয় বার্তা ও দৈববাণী প্রচারিত হোক। ভারতবর্ষে নানা সংকটে এবং দুর্দিনে তাঁর দেখানো পথে চলতে ইচ্ছা পোষণ করেছেন উপরিউক্ত গানটিতে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রার্থনা গীতে ঈশ্বর ও মাতৃভূমির সাথে গভীরতর সংযোগ স্থাপন করেছেন। স্রষ্টার কাছে অর্পণ করেছেন তাঁর গীত বয়ান যা মনে করিয়ে দেয় প্রার্থনাই জীবনের অংশ আর গীত তার অন্যতম অভিব্যক্তি। তিনি উক্ত গানটির মধ্যদিয়ে কঠিন আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা ও শঙ্কাহীন নির্ভীকচিত্তে চলার শক্তি প্রার্থনা করেছেন। যখনই মানুষের জীবনে কোনো সংকটময় পরিস্থিতি আসে তখনই মানুষ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। ঈশ্বরের সম্মুখে মিনতি করে যেন সে পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পায়। গানের বাণীতে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ পাপের জয় দেখেও ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা না হারিয়ে তাঁর পায়ে অটল বিশ্বাসে পড়ে থাকার আহ্বান জানিয়েছে। এ গানের বাণীতে ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে সমর্পনের প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে ।

৫.২ গান-২৮

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে
উদার ছন্দে, পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই- যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তরে,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥ [৪৪]

উদার ভারতের মাতৃরূপের ছান্দিক কাব্যসম্ভারে গানটি মাতৃবন্দনামূলক গানের ভাণ্ডারে এক অনবদ্য সংযোজন। রবীন্দ্রনাথ এই গানটিতে বিস্তৃত ভূমির এই ভারতবর্ষের বুকে সমস্ত মানবের যে নিশ্চিন্ত আশ্রয় সে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন । এ গানে বন্দিত হয় ভারতমাতার পবিত্র স্থানে জেগে উঠার বাণী। রবীন্দ্র সাধনার অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরানুভূতি ও অতীন্দ্রিয় চেতনা। কিন্তু এই গানে তা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। গানের

বাণীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এখানে নিজেই উক্ত গানের চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তিনি নিজেকে নিজেই বলছেন "হে মোর চিত্ত" অর্থাৎ নিজের হৃদয়কে বলছেন এই পবিত্র স্থানে জেগে উঠতে। আর এই পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে পরমানন্দে ধ্যানগম্ভীর ভাবে অর্থাৎ ভক্তি সহযোগে নর-দেবতাকে ডাকার আহ্বান জানিয়েছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানের পরবর্তী অংশে বেশকিছু জাতির নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন/ শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন। উক্ত জাতিসত্ত্বার সবাই এই ভূখণ্ডে এসে এক হয়ে লীন হয়ে গেছে একই দেহে। তারা এই মাতৃভূমিতে মায়ের দুগ্ধ পানের স্বাদ পেয়েছে। ফলে তারা আর ছেড়ে যাবে না। ঠিক পরবর্তী অংশে কবি নিজেই সবাইকে পবিত্রতীর্থে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই তিনি বলছেন আর্য, অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, ইংরাজ, খৃস্টান, ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার; বাণীতে রবীন্দ্রনাথ এসো এসো শব্দ প্রয়োগের মধ্যদিয়ে যে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তা শুধুমাত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতার নিমিত্তেই। কবি এখানে স্বাধীনতা শব্দটি উল্লেখ না করলেও এখানে গভীরভাবে তারই আভাস পরিলক্ষিত হয়।

৫.৩ গান নং ২৯

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর' ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে, জাগ্রত ভগবান হে...[৪৫]

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ গানটির পটভূমির যে প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই সেই বিবেচনায় গানটি জাগরণ অথবা প্রেরণামূলক গানের পর্যায়ে হতে পারতো। কিন্তু বাণী বিচেনায় গানটি মাতৃবন্দনা পর্যায়ের দাবিদার। বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসুর আহ্বানে বেসান্তের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে একটা জনসভা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেখানে বেসান্তের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতির কথা জেনে তাঁকেও আমন্ত্রণ জানানো হলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহ থেকে এসে এই প্রতিবাদসভায় গাইবার জন্য রচনা করলেন "দেশ দেশ নন্দিত

করি মন্দ্রিত তব ভেরী" গানটি। গানটির বাণী পর্যালোচনা করে বলা যায় রবীন্দ্রাথের গীতশৈলীতে ভাষার প্রভেদ যতটা ব্যপক, অন্যান্য গীতিকারের ততটা নয়, এই গানটিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মাতৃভূমির অস্তিত্বের সংকটে মানবের মনে জাগরণের আকাঙ্ক্ষা এবং সকল মানবের উদার ভারতের আপন পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে স্বদেশ পর্যায়ের এ গানে। রাবীন্দ্রিক বাণী প্রয়োগে গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত এবং তাদের অবদানের মর্মবাণী। গানের বাণীর মাধ্যমে ভারতের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ প্রদান করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গানের বাণীতে স্বদেশের স্বাধীনতার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার ইঙ্গিত যেমন ভাবে দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে বিজয় অদূর হস্তগত নয় এ বিষয়টিও অবগত করেছেন।

৫.৪ গান নং ৩০

জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে।

জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই, মগন মিথ্যা কাজে ॥
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি ধরো গো পূজার থালি,
রতন প্রদীপখানি যতনে আনো গো জ্বালি,
ভরি লয়ে দুই পাণি বহি আনো ফুলডালি,
মার আহ্বানবাণী রটাও ভুবনমাঝে ॥ [৪৬]

মাতৃভূমির অস্তিত্বের সংকটে মানবের মনে জাগরণের এবং উদার ভারতে আপন পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে স্বদেশ পর্যায়ের এই গানে। আমার জানি, ভারতবর্ষের ভাবদর্শন অনুযায়ী জন্মভূমি জননীর ন্যায়। কবি বলছেন জননীর দ্বারে আজি শঙ্খ বাজে। সনাতন ধর্মমতে শঙ্খ সাধারণত পবিত্র ধ্বনি যে পবিত্র ধ্বনি হয়তো স্বাধীনতার বার্তা বহন করে আনছে। তাইতো কবি মিথ্যা কাজে মগন না থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বার বার উচ্চারণ করেছেন থেকো না থেকো না, মগন মিথ্যা কাজে। থালি ভরে পুষ্প পল্লব আর সাথে রতন প্রদীপ আনতে বলেছেন পূজার নিমিত্তে। সম্পূর্ণ গান জুড়ে বাণীর তেমন কারুকাজ লক্ষ্য করা যায় না, সরলরৈখিকভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাণী বসিয়ে গেছেন। এই গানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইন ' জননীর দ্বারে আজি শঙ্খ বাজে' যাকে আমরা পূর্বে স্বাধীনতার বার্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। এই লাইন ব্যতিত নিচের সবটুকু স্থানে শুধুমাত্র মাতৃভূমিকে পূজার আসনে রেখে নানা রকম স্বাধীনতার আগমনী

বার্তাকেই নির্দেশ করেছেন। যার জন্য একদম শেষ লাইনের বাণীতে নবসাজে সজ্জিত হওয়ার জন্য বিশেষ আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত মানবের স্মরণ এবং তাদের অবদান বর্ণনার মাধ্যমে ভারতের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে উক্ত গানে।

৫.৫ গান নং ৩১

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে...[৪৭]

বাণী বিশ্লেষণের আগে গানটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা দরকার । কারণ উক্ত গানটির ভাষা বাণীতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অপরদিকে স্বদেশ পর্যায়ের এই গানটি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে পরিচিত। তবে এই কথা অনস্বীকার্য যে গানটি জাতীয় সংগীত হওয়ার পর থেকেই গানটিকে ঘিরে কিছু বিতর্ক দানা বাঁধে। বলাবাহুল্য গানটি লেখা হয়েছিল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজা পঞ্চম জর্জের দিল্লি-দরবার পরির্দশনের কিছুদিন আগে। আর এই গানটি ২৭ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে প্রথম পরিবেশিত হয়েছিল ।

> "...সেই দিনের এজেন্ডা ছিল রাজা পঞ্চম জর্জকে একটু আনুগত্যমূলক স্বাগত জানানোর প্রস্তাবনা। রাজার সম্মানে সেদিন হিন্দিতে রামভূজ চৌধুরীর একটি গান গাওয়া হয়। আবার সেই দিনই রবীন্দ্রনাথের মতো এক বিশিষ্ট ব্যক্তির গান অনুষ্ঠানে গীত হওয়ায় সংবাদমাধ্যমের ভুলে একটি ভ্রান্ত খবর প্রচারিত হয় যে রবীন্দ্রনাথের গানটিও সম্রাটের প্রতি সম্মানার্থে রচিত হয়েছে। পরদিনের ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিতে এই সংবাদ প্রচারিতও হয়ঃ "বাঙালি কবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষত সম্রাটকে স্বাগত জানিয়ে একটি গান রচনা করেছেন।" স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রবিরোধীগণ প্রচার করতে থাকেন যে গানটি আসলে সম্রাটের বন্দনাগান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সংবাদপত্রগুলির কয়েকটি বন্দেমাতরম রবীন্দ্রনাথের রচিত ও জনগণমন-কে হিন্দি গান আখ্যাও দিয়েছিল।" [৪৮]

কিন্তু এর আসল ঘটনা জানা যায় বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী পুলিনবিহারী সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন–

> "...সে বৎসর ভারতসম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনও বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ কোনো জর্জই কোনক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন।[৪৯]

তবে গানটি সম্পর্কে গণপরিষদের অধিবেশনে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষণা করেন।

> "The composition consisting of the words and music known as Jana Gana Mana is the national anthem of India... and the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honored equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it."[৫০]

অপরদিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর নয় বছর পর ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি পেল জনমনগণ গানটি। এই প্রসঙ্গে জওয়াহরলাল পরবর্তীকালে বলেছেন :

> "During my last visit to him, I requested him to compose a National Anthem for the new India. At that time I did not have Jana-Gana-Mana', our present National Anthem, in mind. He died soon after. It was a great happiness to me when some years later after the coming of Independence we adopted Jana-Gana-Mana' as our National Anthem. I have a feeling of satisfaction that I was partly responsible for this choice, not only because it is a great national song, but also because it is a constant reminder to all our people of Rabindranath Tagore".[৫১]

গানটির বাণী বিশ্লেষণ করতে হলে গানটির প্রথম চরণগুলির ভাবার্থ জেনে নেয়া উত্তম।

গানটির শুরুর লাইনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জনগণকে উন্নতির চাবি-কাঠি হিসেবে চিহ্নত করেছেন। অর্থাৎ ভারতের ভাগ্য পরিবর্তন একমাত্র জনগণের হাতেই। গানটিতে বেশকিছু প্রদেশের নাম উল্লেখ পূর্বক উক্ত স্থানের মানুষদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন গানের মধ্যদিয়ে। আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য বাণীবৈচিত্র্য। সেই ক্ষেত্রে প্রসংগত উল্লেখ করতেই হয় একবিংশ শতাব্দির প্রথম দশকেই উক্ত লাইনের সিন্ধু শব্দ নিয়ে নানা রকম বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই প্রসংগে উল্লেখ করতে হয়;

> "ভারতের জাতীয় সংগীতের সিন্ধু শব্দটিকে পরিবর্তিত করে কাশ্মীর শব্দটি যোজনা করার দাবি ওঠে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে। যাঁরা দাবি তুলেছিলেন, তাদের যুক্তি ছিল, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারত বিভাগের পর সিন্ধু প্রদেশ সম্পূর্ণত পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দাবির বিরোধীরা পাল্টা যুক্তি দেন, জাতীয় সংগীতে সিন্ধু শব্দটি কেবলমাত্র সিন্ধু প্রদেশ নয়,

বরং সিন্ধু নদ ও ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ সিন্ধি ভাষা ও সংস্কৃতিরও পরিচায়ক। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই যুক্তি মেনে জাতীয় সংগীতের ভাষায় কোনোরূপ পরিবর্তনের বিপক্ষে মত দেন।"[৫২]

গানের বাণী বিশ্লেষণ করলে ভারতমাতার প্রতি যে সাধারণ চিন্তার উদ্বেগ হয় তাতে মাতৃবন্দনার পর্যায়ভূক্ত হওয়ার জন্যে স্বার্থকতার দাবি রাখে। গানটিতে জনগণের যে অধিনায়ক জনগণের ভাগ্য বিধাতা যে ঈশ্বর তাঁর জয়গান গাওয়া হয়েছে। পুরো গানটিতে কবি বলেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন গোষ্ঠী পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ হিমাচল এর নদী থেকে মহাসমুদ্র ঈশ্বরের নামে জেগে ওঠে তার আশীর্বাদ কামনা করে। তার নিজস্ব গান গেয়ে থাকে। শুরুতে জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে, এখানে জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় বলেছেন। "জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে" এই একই ধুয়া প্রতিটা অন্তরার শেষে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে স্থায়ী ও অন্তরায় ঈশ্বরকে একেক জায়গায় একেকভাবে সম্বোধন করেছেন। জনগণমন-অধিনায়ক, জনগণমঙ্গলদায়ক এবং প্রথম অন্তরায় বলেছেন ভারতভাগ্যবিধাতা পরিচায়ক তৃতীয়াশে জনগণদুঃখত্রায়ক এবং সর্বশেষ অন্তরায় রাজেশ্বর অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরকে রাজার রাজা হিসেবে অভিহিত করেছেন। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মুসলমান শিখ জৈন পারসিক সব ধর্মের লোকই জনগণ ও বিধায়ক ঈশ্বরেরই জয়গান গায়। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় তিনি চিরসারথী দারুণ বিপ্লব মাঝে তাঁর শুভশঙ্খধ্বনি শোনা যায়। গভীর অন্ধকারে দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে স্নেহময়ী মাতারূপে সাহস যুগিয়েছেন তিনি।

উক্ত গানের প্রতিটা শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে। এ সংগীতে ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চল এবং নদী পাহাড়ের নাম আছে। পশ্চিমবঙ্গে, আসামে, ত্রিপুরায় বা বাংলা অধ্যুষিত এলাকাতে এবং হিন্দি ভাষাভাষীরা এ গানটি সংস্কৃত বা হিন্দি উচ্চারণে গেয়ে থাকে। গানটির উচ্চারণ বিশ্লেষণ করে জনৈক গবেষক বলেছেন

> জনগনমন - অধিনায়ক জয় হে কে উচ্চারণ করি জোনোগনো মনো..এটা আমাদের বাংলা উচ্চারণ "ও" এর প্রাধান্য বেশী। আমরা "জ" কে "জঅ" না বলে হালকা ভাবে "জও" উচ্চারণ করি। আর ওরা "জ" কে জঅ আর জা এর মাঝামাঝি এক ধরণের উচ্চারণ করে যেমন আমরা ইংলিশে jaaz উচ্চারণ করতে jaa টা বলি তেমন। আমরা বলি যমুনা ..ওরা বলে yamuna. নদী কিন্তু একই। আমাদের বাংলা উচ্চারণে স, শ, ষ এর কোন তফাত ধরা পড়ে না। আমরা " সব" কে শব উচ্চারণ করছি আবার " শব" কেও শব। ওরা " স " কে " ঝ " এর মতো উচ্চারণ করে আর " শ "কে " ঝয" এর মতো উচ্চারণ করে। তাই ওরা সিন্ধু কে Sindhu বলে আর আমরা উচ্চারণ করি শিন্ধু। [৫৩]

উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ গানটি বাংলায় রচনা করলেও ভারতবর্ষীয় জনগণ তাঁদের নিজস্ব উচ্চারণশৈলীতে গানটি গেয়ে থাকেন পরম যত্নে।

ভারতবর্ষকে পরাধীনতার কবল থেকে মুক্ত করতে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই সোচ্চার ছিলেন। তাঁর শিল্পসাধনার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে যেমন সচেতন করেছেন তেমনি জনগণের মাঝে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ব্রিটিশের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। হাতে অস্ত্র না তুলেও তিনি তাঁর লেখনীর মধ্যদিয়ে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করবার সংগ্রাম করে গেছেন। হিন্দুমেলা থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং পরিবর্তী সময়ে রচিত তাঁর সৃষ্ট স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলো বাঙালীর জাতীয় জীবনে বিশেষ স্থানলাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের মাধ্যমে দেশের মানুষকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। যার ফলে গৌরবের পরিবর্তে নির্ভীক উন্মাদনা ফুটে উঠেছে মানুষের মনে। তাঁর গানে আরও প্রকাশ পেয়েছে আত্মশক্তিতে পিছিয়ে পড়া জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা ও সংকল্প। গানগুলোর বাণী বিশেষভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এখানে আত্মসুখভোগীদের প্রতি বিচিত্র ধিক্কারের প্রতিচ্ছবি। দেশের মানুষকে স্বাধীনতায় উজ্জীবিত করার জন্যে সবার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন, দাঁড় করিয়েছেন সাধারণ মানুষের সারিতে, দিয়েছেন উৎসাহ, যুগিয়েছেন সাহস।

তথ্যসূত্র

১. সুধীর চক্রবর্তী, *বাংলা গানের সন্ধানে*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯৭ পৃষ্ঠা. ২৬।
২. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্মারক-গ্রন্থ {সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ], বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১ পৃষ্ঠা, ২৪২
৩. ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী, *রবীন্দ্র সংগীত লোকসংগীত, কীর্তন ও উচ্চঙ্গ সংগীতের প্রভাব, দি জেনারেল বুকস, কলকাতা*। পৃষ্ঠা. ৭৩।
৪. সম্পা. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী, *সমকালীন*, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৪ চৌধুরী রোড, কলকাতা, ভাদ্র, ১৩৬২, পৃষ্ঠা, ২২।
৫. সম্পা. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী, *সমকালীন*, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৪ চৌধুরী রোড, কলকাতা, ভাদ্র, ১৩৬২, পৃষ্ঠা, ২২।
৬. সিতাংশু রায়, সৌন্দর্যদর্শন ঃ *প্রাথমিক পরিচয়*, সুবর্ণরেখা কলকাতা, পৃষ্ঠা, ৪৮।
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড-অষ্টাদশ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৬ পৃষ্ঠা, ৬২৭-৬২৮
৮. সিতাংশু রায়, সৌন্দর্যদর্শন ঃ প্রাথমিক পরিচয়, পৃষ্ঠা, ৪৮।
৯. https://www.millioncontent.com/2021/09/blog-post_195.html vig date- 10-10-2021.
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্ত*, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা ডিসেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা, ১৩।
১১. সুধীর কুমার নন্দী, *নন্দনতত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা, ২০২।
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, বিশ্বভরতী, মাঘ, ১৪২৪ পৃষ্ঠা, ২৪৩
১৩. তদেব পৃষ্ঠা, ২৪৪
১৪. তদেব পৃষ্ঠা, ২৫৫
১৫. তদেব পৃষ্ঠা, ২৫৭
১৬. তদেব পৃষ্ঠা, ২৬৫
১৭. তদেব পৃষ্ঠা, ২৬৪
১৮. তদেব পৃষ্ঠা, ২৬৩
১৯. তদেব পৃষ্ঠা, ২৫৫
২০. তদেব পৃষ্ঠা, ২৬৩
২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পৃষ্ঠা , ২৪৬।
২২. তদেব পৃষ্ঠা, ২৫৩
২৩. তদেব পৃষ্ঠা, ২৫৮
২৪. তদেব পৃষ্ঠা, ২৬৪
২৫. তদেব পৃষ্ঠা, ২৫৮
২৬. তদেব পৃষ্ঠা, ২৬০
২৭. তদেব পৃষ্ঠা, ২৪৫-২৪৬
২৮. বদিউর রহমান, *লঙ্গিনাসের সাহিত্য*-তত্ত্ব, গতিধারা, ঢাকা, পৃষ্ঠা, ৫৬।
২৯. বদিউর রহমান, *সাহিত্য স্বরূপ*, গতিধারা, বাংলাবাজার, পৃষ্ঠা, ৩৫।
৩০. তদেব পৃষ্ঠা, ২৪৬
৩১. সুধীর কুমার নন্দী, *নন্দনতত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ডিসেম্বও ১৯৯৬, পৃষ্ঠা, ২০১।
৩২. তদেব. পৃষ্ঠা, ২০৩
৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পৃষ্ঠা, ২৪৭।
৩৪. তদেব. পৃষ্ঠা, ২৪৭।
৩৫. তদেব পৃষ্ঠা, ২৪৮
৩৬. তদেব পৃষ্ঠা, ২৬০
৩৭. তদেব. পৃষ্ঠা, ২৪৪।
৩৮. https://educalingo.com/bn/dic-bn/abhaga vig date- 10-09-2021.
৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পৃষ্ঠা, ২৪৫

৪০. তদেব, পৃষ্ঠা, ২৪৬।
৪১. তদেব পৃষ্ঠা, ২৪৬
৪২. তদেব পৃষ্ঠা, ২৫৮
৪৩. তদেব পৃষ্ঠা, ২৬১ ।
৪৪. তদেব পৃষ্ঠা, ২৫১।
৪৫. তদেব পৃষ্ঠা, ২৫১।
৪৬. তদেব পৃষ্ঠা, ২৬২।
৪৭. তদেব পৃষ্ঠা, ২৪৯।
৪৮. wikipedia.org/wiki/ জনমনগন- অধিনায়ক- জয় হে # ইতিহাস vig date- 03-01-2022.
৪৯. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, প্যাপিরাস, ২০০৮, পৃ. ১১৬ সংগ্রহ wikipedia.org/wiki/ জনমনগন- অধিনায়ক- জয় হে # ইতিহাস vig date- 03-01-2022.
৫০. R.K Dasgupta,`Vandemataram and the Indian National Struggle' Bankimchandra Chatterjee/ Vandemataram, Delhi, University of Delhi 1967, পৃষ্ঠা,১৫।
৫১. Introduction, Rabindranath Tagore 1861-1961/A Centenary Volume New Dehli: Sahitya Akademi, পৃষ্ঠা,Xvi
৫২. wikipedia.org/wiki/ জনমনগন- অধিনায়ক- জয় হে # ইতিহাস vig date- 03-01-2022.
৫৩. https://bn.quora.com, ভারতের জাতীয় সংগীত ও জাতীয় স্তোত্র কোনটি vig date- 03-01-2022.

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের সুর-বৈচিত্র্য

শিল্প সবসময়ই চিরন্তন। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষের ভাব আদান প্রদানের নিমিত্তে মানুষ বৈচিত্র্যময় কণ্ঠ, ধ্বনি ব্যবহার করে আসছে। এর পর বৈদিক যুগ থেকে বেদ-বেদান্তের আমল পর্যন্ত সংগীতের বিপুল পরিবর্তন ও পরিমার্জন চলতে থাকে। স্রষ্টার নৈকট্যলাভের জন্য শ্লোক পাঠ করা হতো সুরের মাধ্যমে। সংগীতের এই হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আজ শিল্পকলার বিশেষ একটি মাধ্যম হিসেবে পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত। আর তাই মানুষ জীবনধারণে আর জীবনযাপনে সংগীতকে তাদের জীবনের অদৃশ্য অঙ্গ হিসেবে বহন করে চলেছে। সেই যোগসূত্রে সংগীত স্রষ্টারগণ মানুষের কাছে পেয়ে থাকে ভালোবাসার সিংহাসন। যুগে যুগে তাঁরা অবির্ভূত হয় এবং তাঁদের সৃষ্টি দিয়ে বেঁচে থাকে হাজার হাজার বছর। এরূপ একজন সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপমহাদেশের অন্যতম সংগীতজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ সাধক ও স্রষ্টা। ঠকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক ভাবপরিমণ্ডলে বড় হয়ে উঠার ফলে জীবনের বিচিত্র চিত্র থেকে অভিজ্ঞতা শিল্প সংস্কৃতিতে প্রয়োগ করতে তাঁর তেমন কষ্ট হয় নি। তাঁর সৃষ্টির সবচেয়ে বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে সংগীত। ভাবের ঐশ্বর্য্য, বাণীর মাধূর্য্য আর সুরের সৌকর্য্যের যে ত্রিবেণী সম্মিলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে তা বিশ্ব সংগীতের এক মহামূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। যে গানের সবচেয়ে বড় দিক হলো রবীন্দ্রনাথের গান সবসময় ও সব মূহুর্তের জন্য প্রাসঙ্গিক। তাঁর রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যের বিবেচনা করলে দেখা যায় শিল্প আর সৃষ্টি আর স্রষ্টা চলেছে অমৃতের প্রবাহের মতো। প্রেম, প্রকৃতি, পূজা, অথবা স্বদেশ চেতনার সংগীত সৃষ্টি করেছেন অপূর্ব মহিমায়। তাঁর গান বর্ণিল বাণী ও সুরশৈলীর দিক থেকে বৈচিত্র্যময়। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের গানগুলি কোনো কোনো সংগীত ধারার প্রভাবে অথবা প্রচলিত রাগ রাগিনীর অনুসরণে সৃষ্টি হলেও পরবর্তীতে প্রচলিত সুরের ঝর্ণাধারায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে ক্রমে ক্রমে নূতন ও নিজস্ব সুর সৃষ্টির ফল্গুধারা প্রবাহিত করেছিলেন মহত্ত্বের সাথে। তাঁর সুরের ধারায় রাগ-রাগিনী এবং সাথে বাঙালীর নিজস্ব লোকগানের সৌন্দর্যশৈলীর সাথে সমঝোতা ও বিভিন্ন সুরের মিশ্রণে নানা ঢঙে প্রবর্ত্তন করেছেন রবীন্দ্র সংগীত। পরিস্কারভাবে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ সুরপ্রয়োগের ক্ষেত্রে বাণীর ভাবপ্রকাশটাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। ফলে ভাবপ্রকাশের জন্য যখন যে সুর দরকার তাকেই ধার করতেন। এজন্য তাঁর গানে রাগ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিশ্র রাগের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আবার তিনি কোথাও কোথাও ভাবপ্রকাশের জন্যে একক রাগের সাথে সমপ্রকৃতি বা সম্পূর্ণ বিপরীত রাগের স্বরযোজনা করেছেন অনেক সময়। কিন্তু গানের কাঠামোতে রয়েছে নির্দিষ্ট একটি রাগই। এভাবে তিনি তাঁর সংগীতকে সময় ও কালোত্তীর্ণ করেছেন। ররীন্দ্রনাথের বিপুলসংখ্যক গানের সুর বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এতে শাস্ত্রীয় রাগের সাথে ঐতিহ্যবাহী বাংলা লোকসংগীতের সুর এবং এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য সুরের মহামিলন ঘটিয়েছেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে

বিচিত্র ধারা থেকে সুর অনুসন্ধান ও তাঁর গানে প্রয়োগের পরও তিনি সংগীতকে নির্দিষ্ট কোনো নিয়মে আবদ্ধ করেন নি। ফলে রবীন্দ্র সংগীত উদ্ভাসিত হয়েছে আপন মহিমায়। তিলে তিলে তিলোত্তমা করে সৃষ্টি করা রবীন্দ্র সংগীত; যার মধ্যে স্বদেশ পর্যায়ের গানের সুরশৈলীর বিশ্লেষণই এ অধ্যায়ের প্রাণবস্তু।

ধ্রুপদ

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। সংগীতের বৈচিত্র্যপূর্ণ ধারার মাঝে ধ্রুপদ মূলত শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি জনপ্রিয় ধারা বলে বিবেচিত। যার আভিধানিক অর্থ অপরিবর্তনীয়। শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যা ছিল,আছে এবং থাকবে। ধ্রুপদের ধ্রুব শব্দটি বলতে সাধারনত সৃষ্টিকর্তাকে বুঝায়। অর্থাৎ যে গানে সৃষ্টিকর্তার প্রার্থনা করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে যে গানে মূলত ঈশ্বরের প্রার্থনা করা হয় তাই মূলত "ধ্রুপদ" গান। "ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী'র 'কণ্ঠকৌমুদিতে' ধ্রুপদ গানের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– যে গীতে দেবতাদের লীলা, রাজাদিগের যশ ও যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতি থাকে তাহাকে ধ্রুপদ বলে।"[১]

তবে ধ্রুপদ গানের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলেও গবেষকগণ এর উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে বিচিত্র মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। বলাবাহুল্য সেই সময়ের লৌকিক গানই সকল প্রকার শাস্ত্রীয় সংগীতের উৎসমূল। বৈদিক যুগে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক গান এক সাথে এগিয়েছে। লৌকিক গান আবার দুই ধরনের। যেমন–

১. গান্ধর্ব লৌকিক
২. দেশী লৌকিক।

১. গান্ধর্ব লৌকিক- গান্ধর্ব লৌকিক গান্ধর্বদের সৃষ্ট গান। এই ধরনের গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে গায়করা নিয়মের ব্যপারে খুব সচেতন থাকতেন। দেশকাল আর পাত্র ভেদে এর কোনোরকম পরিবর্তন বা সংযোজন হতো না। যা সব সময় নিদিষ্ট একটি নিয়মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো।

২. দেশী লৌকিক- দেশী লৌকিক আঞ্চলিক গান। সাধারণত এখানে দেশী শব্দটি অঞ্চল অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ ধরনের গান কোনো ধরনের নিয়ম কানুন বা কোনো্ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকে না। এ গানে যে কোনো শিল্পী স্বতস্ফূর্তভাবে মনের ভাবের প্রকাশ ঘটায় সুরের মাধ্যমে। তবে একটি শিল্পের যতটুকু নিয়ম মানা দরকার দেশী লৌকিক অবশ্যই সেটা মেনে চলে।

দেশি লৌকিক গানের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে প্রদীপকুমার ঘোষ একে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা–

১. অভিজাত বা নাগরিক

২. লোক বা গ্রাম্য

৩. উপজাতীয়।

এ প্রসঙ্গে গবেষক আরো বলেন–

> "অভিজাত দেশি-গান দেশি রাগ ও তালাশ্রিত ছিল বলেই গানের পদ বা গীতি-কবিতার শীর্ষদেশে রাগ ও তালের উল্লেখ থাকতোই। এই জাতীয় গানের পদ বা গেয়-পদকে বলা হতো প্রবন্ধ (First Class Composition)| ...অর্থাৎ, বলা যায়- গেয় পদ বা প্রবন্ধ যেহেতু অভিজাত দেশি গান তাই দেশি রাগ ও তাল অবলম্বনে এর সুর আরোপিত হয়। প্রবন্ধের দুটি প্রধান অংশ থাকে, যথা- ১) মাতু এবং ২) ধাতু। মাতু হচ্ছে বর্ণনীয় বিষয় এবং ধাতু হচ্ছে গেয় পদের খণ্ডিত রূপ, যথা: উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ। ধাতুকে চলতি কথায় তুক বলা হতো।"[২]

ধ্রুপদের উদ্ভব নিয়ে সংগীত গবেষকদের মাঝে নানা রকম বিতর্ক থাকলেও এই কথা মোটামুটিভাবে অনেকেই একমত যে প্রাচীন প্রবন্ধ গানের অন্তর্গত সালগ সূড় প্রবন্ধ হতে ধ্রুপদের সৃষ্টি হয়েছে। সালগ সূড় প্রবন্ধ সাত প্রকার। তার অন্যতম ধ্রুব প্রবন্ধ। এ সাতটি প্রবন্ধের তিনটি সংগীত অংশ বা ধাতু ছিল। যেমন-উদগ্রাহ,অন্তর এবং আভোগ। মেলাপক এখানে বর্জিত। তবে মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ প্রভৃতির ছয়টি করে অঙ্গ থাকতো।

> ধ্রুব প্রবন্ধটির উদগ্রাহ অংশটির দুটি ভাগ। উদগ্রাহের পরের অংশটির নাম অন্তর। আভোগ অংশও দুটি খন্ড। সুতরাং দেখা যায়, শুদ্ধ সূড় প্রবন্ধে যেখানে চারটি ধাতু (উদগ্রাহ,ধ্রুব, মেলাপক,আভোগ) সেখানে আমরা ধ্রুব পদে পাচ্ছি উদগ্রাহ(দুই খন্ড),অন্তর এবং আভোগ(দুই খন্ড)। প্রবন্ধ সংগীত এর রূপান্তর সম্পর্কে বলা হয় "যে কোন কারনেই হোক,উদগ্রাহ ও মেলাপক এ দুই অংশ বাহুল্য মনে হওয়ায় এ দুই অংশ একেবারে বাদ দিয়ে ধ্রুব বা ধ্রুকলি থেকে গান আরম্ভ করে আভোগে শেষ করার রীতি পরিকল্পিত হয়। ধ্রুবকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত সংগীত পদ্ধতিকে স্বভাবতই ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ নামকরণ করা হয়। ধ্রুপদের চার ধাতু নিয়ে বলা হয়েছে " প্রাক্তন ধ্রুবস্থ উদগ্রাহটি আমাদের বর্তমান স্থায়ী,অন্তর অংশটি বর্তমানে অন্তরা নাম ধারন করেছে।আভোগের প্রথম খন্ডটি বর্তমানে সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় আভোগ নামেই পরিচিত আছে।"[৩]

এ সকল যৌক্তিক আলোচনার উপর আস্থা রেখে বলা যায় ধ্রুপদ হলো মূলত সালগসূড়ের অন্তর্গত ধ্রুবাগীতির পরিবর্তিত রূপ। অপরদিকে পদ অর্থাৎ বাণী কথাটি সমগ্র গানটিকে বোঝানো হতো। তাই প্রথমে ধ্রুব+পদ= ধ্রুবপদ আসে পরে এর সংক্ষিপ্ত আকারে ধ্রুপদ বলা হয়ে থাকে।

ধ্রুপদ গানের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।

১. ধ্রুপদ গানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ চারটি অংশ থাকে। কোনো কোনো গানের শুধুমাত্র স্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটি অংশও দেখা যায়।

২. ধ্রুপদ গানের গতিতে কোনো প্রকার চাঞ্চলতা নেই। এর প্রকৃতি গাম্ভীর্যপূর্ণ ।

৩. ধ্রুপদের বান্ বা বাণী গায়বার সময় আঞ্চলিক ভঙ্গি অনুসারে পরিবর্তিত হয় অনেক সময়।

৪. ধ্রুপদে গওহার বাণী, খাণ্ডর বাণী, ডাগর বাণী ও নওহার বাণী এই চার ধরনের গীতরীতি দেখা যায়। এখানে বাণী অর্থে সাধারণত গাইবার রীতিকে (Style) বুঝানো হয়েছে।

৫. ধ্রুপদ সংগীতের বিষয়বস্তু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার বা মহান চরিত্রের প্রশংসায় বিভোর, প্রকৃতি কথন, দেব/দেবীর প্রশংসা ও গুণ-কথনকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

৬. ধ্রুপদাঙ্গের গান পাখোয়াজ নামক একধরনের বাদ্যযন্ত্রের (তাল যন্ত্র) সংগতে গাওয়া হয়ে থাকে।

৭. চৌতাল, আড়া চৌতাল, তেওড়া,ঝাপতাল, সুরফাঁক তাল প্রভৃতি তালে ধ্রুপদ গাওয়া হয়ে থাকে।

৮. ধ্রুপদ সওয়াইয়া, দেড়িয়া, দ্বিগুন, চৌগুন প্রভৃতি লয়ে গাওয়া হয়।

৯. দ্রম, তুম, তানা, রে, রি, না, তানা প্রভৃতি শব্দ সহযোগে আলাপ করা হয়।

১০. ধ্রুপদের গায়নশৈলীতে মীড়, মুখরী, তান প্রভৃতির প্রয়োগ হয় না। এ রীতিতে গমক, উপজ এর বহুমাত্রীক প্রয়োগশৈলী দেখা যায়।

১১. ধ্রুপদে অধিকমাত্রায় লয়কারীর প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ধ্রুপদ গাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করা হতো। এ সম্বন্ধে প্রদীপকুমার ঘোষের মতামত উল্লেখ করা হলো–

১. ধ্রুপদের ভাষা হবে শুদ্ধ বৃজভাষা বা 'খোড়ী-বোলী'। তবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধ্রুপদকে 'মার্গ গীত' বলা হবে।
২. .ধ্রুপদে চারটি তুক থাকবে: ধ্রুব (অর্থাৎ স্থায়ী), বৈকল্পিক অন্তর বা অন্তরা, ভোগ বা সঞ্চারী এবং আভোগ।
৩. ধ্রুপদের বিষয়বস্তু: নায়ক প্রশংসা, প্রতিপালক প্রশংসা, প্রকৃতি বর্ণনা, দেবমহিমা বর্ণনা, নায়ক-নায়িকা ভেদ, নাদ-প্রশংসা, গুণ-কথন ইত্যাদি।
৪. ধ্রুপদে ব্যবহৃত রাগ: সমস্ত প্রচলিত রাগই ধ্রুপদের পক্ষে উপযুক্ত। তবে চঞ্চল প্রকৃতির ও রাগে খুব একটা গাওয়া হয় না।
৫. ধ্রুপদে প্রযোজ্য তালসমূহ: প্রসিদ্ধ একতালী (পরবর্তীকালের চৌতাল), ঝম্পতাল (ঝাঁপতাল), সূল তাল (সুরফাঁক্তা), তেওড়া বা তীব্রা বা গীতাঙ্গী, শিখর তাল, আড়া চৌতাল, রূপক, ঢিমা তেতালা, সওয়ারী প্রভৃতি। গাওয়ার সময় তালের মাত্রাবিভাগ হাতে প্রদর্শন করা বাঞ্ছনীয়।
৬. ধ্রুপদের বান্ বা বাণী অর্থাৎ গাইবার আঞ্চলিক ভঙ্গি অনুসারে বান্ (পরবর্তীকালের ঘরানা) অনুসরণ করা হয়।
[৪]

গান

এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ

এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী
তোমার স্থির অমর আশা ॥
অনির্বাণ ধর্ম আলো সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো
সঙ্কটে দুর্দিনে হে,
রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে ॥
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম তব নির্বিদার
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক ।
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়–
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে

মা । –সরা মা । পা –া ।। না –া । -র্সা র্সা । –া র্সা । র্সা –া । র্সনা র্রর্সা । [র্]ণা –া ।
এ ০০ ভা র ০ তে ০ ০ রা ০ খো নি ত্ ত০ প্র০ ভু ০

। ণা ধা । ণা ধা । পা -মা । -ধা পা । –া পা । –া পা ।
ত ব শু ভ আ ০ ০ শী র বা ০ দ

। রা রা । রা পা[ম] । মা -গা । গা গমা । রা রা । সা সা ।
তো মা র অ ভ য় তো মা০ র অ জি ত

। রা মা । রা মা । -পা পা । মা পা । পা না । -র্সা র্সা
অ মৃ ত বা ০ ণী তো মা র স্থি ০ র

। র্সনা র্রর্সা । র্রণা ধপা । -ধা [প]মা । -গরা রগা । -সরা মা । পা –া ।।
অ০ ম০ র০ আ০ ০ শা ০০ “এ০ ০০ ভা র

।।{ মা পা । -া না । -া নর্সা । র্সা -া । র্সা র্সা । -া র্সা ।
অ নি র্ বা ০ ণ০ ধ র্ র্মআ ০ লো

। র্সা^ন র্সা । র্সা র্রা । -র্মা র্রা^{র্স} । র্সনা -র্রর্সা । র্রসা ^{র্র}ণা । -া ধা} ।
স বা র উ র্ ধে জা০ ০০ লো জা ০ লো

। পা -া । -ধা মা । পা -া । ধা -া^ম । মা ^মগা । -া^র রা ।
স ০ ঙ্ ক টে ০ দু র দি নে ০ হে

। মা -পমা । পা না । -া নর্সা । র্সা র্সা । -া র্সা । -া র্সা ।
রা ০০ খো তা ০ রে০ অ র ণ্ শে ০ তো

। র্সনা র্রর্সা । র্রণা ধপা । -ধা ^পমা । -গরা রগা । -সরা মা । পা -া ।।
মা০ ০০ বি০ প০ ০ থে ০০ এ ০০ ভা র ০

।।{ ধা -া । ধা -া । ধা ধা । ণধা -র্সা । -ণা ধা । -া পা ।
বো ক্ খে ০ বাঁ ধি দা০ ০ ও তা ০ র

। মা -পা । না র্সা । র্রা -না । র্সনা -র্রর্সা । র্রর্সা র্রণা । -া ধা ।
ব র ম ত ব ০ নি০ ০র্ র্বি০ দা ০ র

। পা -া । -ধা মা । -পা পা । ধা পা । মা -া । গা রা।
নি ০ শ্ শ ঙ্ কে যে ন স ন্ চ রে

। রা -া । -পা পা । -া -া । পা -া । -া -া । -া -া }
নি ০ র্ র্ভী ০ ০ ক ০ ০ ০ ০ ০।

।{ মা -পা । পা না । –া নর্সা । র্সা –া । র্সা র্সা । –া –া ।
পা ০ পে র ০ নি০ র ০ খি জ ০ য়

। র্সা –া । র্সা –া । র্সা র্সা । র্রা -ণা । –া ধা । –া –পা}
নি ষ্ ঠা ০ ত বু ও ০ ০ র ০ য়্

। পা –র্রর্সা । র্রা –া । র্রা র্রা । র্রা র্রমা । র্রা না । র্সা র্সা।
থা ০০ কে ০ ত ব চ র০ ণে অ ট ল

।র্সনা –র্রর্সা । –র্রণা ধপা । –ধা ঁমা । -গরা রগা ।–সরা মা । পা –া। ।।
বি০ ০০ শ্া শা ০ সে ০০ “এ০ ০০ ভা র” ৫

স্বরবিতানের সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডে “এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু” গানাটির স্বরলিপির প্রথমে কোনো রাগ তালের নির্দেশ নেই। কিন্তু গানটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এ গানাটি চৌতালে নিবদ্ধ ধ্রুপদাঙ্গের গান। গবেষক সুধীর চন্দ তাঁর রবীন্দ্র সংগীত রাগ সুর নির্দেশিকা গ্রন্থে গানটির রাগ নির্দেশ করেছেন “রাগ দেশ”।

উল্লেখ্য যে বর্তমানে প্রচলিত দেশ রাগের চলনের সাথে আলোচ্য গানের ব্যবহৃত চলনের বেশকিছু স্বর-সংগতি পরিলক্ষিত হয়। আবার দেশ রাগ বর্হিভূত বেশকিছু ব্যতিক্রমী স্বর-সংগতিও এই গানে বিদ্যমান। যার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় গানটি মিশ্র দেশ রাগে সুরারোপিত। কোনো কোনো গবেষকদের মতে প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত সুরটমল্লার রাগে এ গানটি বাঁধা।

১. মা পা নি র্সা র্রে
পা মা গা, গা মা রে সা

২. র্সাণি র্রেসা র্রেণি ধাপা, ধা মা গারে রেগাসা
ধ, নি ধা র্সা নি ধা পা

৩. মা পা নি র্সা র্রে ণি
মা পা ধা মা গা রে। (গানের বাণী স্বরলিপি অংশে দ্রষ্টব্য)

সাধারণত ধ্রুপদাঙ্গের গানে রাগের চলন কড়াকড়িভাবে রক্ষা করা হলেও এ গানে তেমনটা রক্ষা করা হয় নি। সে বিবেচনায় গানটি সম্পূর্ণ আলাদা। তবে এ কথা স্পষ্টভাবে বলে রাখা দরকার গানটি যে ধ্রুপদাঙ্গের তা বুঝতে অসুবিধা হয় নি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের স্বার্থকতা।

রাগ দেশ

খাম্বাজ ঠাঁটের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম একটি রাগ হলো দেশ রাগ। এ রাগে আরোহণ শুদ্ধ নিষাদ ও অবরোহণে কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ রাগটি ঔড়ব-সম্পূর্ণ প্রকৃতির। এর আরোহণে পাঁচটি নোট এবং অবরোহণে সাতটি নোট ব্যবহৃত হয়।

অবরোহণে কোমল 'নি' ছাড়া বাকি স্বরগুলো শুদ্ধ।

আরোহণ: সা $^{মা}$রে মা পা নি র্সা।

অবরোহণ: র্সা ণি ধা পা ধা মা গা রে পা মা গা রে গা সা।

পকড়: রে, মা পা নি সা রে ণি ধা পা মা গা রে।

বাদীস্বর: রে

খেয়াল

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে কয়টি জনপ্রিয় ধারা রয়েছে তার মধ্যে প্রধানতম একটি ধারা হলো খেয়াল। সংগীতের ইতিহাস আলোচনায় সবচেয়ে প্রাচীনতম ধারার মধ্যে খেয়ালের অবস্থান দ্বিতীয়। সর্বপ্রাচীন ও শক্তিশালী ধারা ধ্রুপদের চেয়ে অল্প অলংকার প্রয়োগে বিস্তৃত সুযোগ সুবিধার জন্য এক ভিন্নধর্মী গীতশৈলী সৃষ্টির নিমিত্বেই খেয়াল গানের উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। রাগসংগীতের প্রাচীনরূপ প্রবন্ধগীতির সাথে যথেষ্ট মিল থাকায় খেয়ালকে এর উত্তরসুরি হিসেবেও ধারণা করে অনেকেই। তবে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ উস্তাদ আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫) কাওয়ালী গানকে সংস্কারের মাধ্যমে খেয়াল গানের সূচনা করেন বলে সংগীত গবেষকদেরা অনুমান করেন। এ প্রসঙ্গে প্রদীপকুমার ঘোষের মতামত স্বরণযোগ্য –

> "পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুরের সংগীতজ্ঞ সুলতান হুসেন শর্কী তাঁর নিজ রাজ্যে প্রচলিত 'চুটকল' নামক সংকীর্ণ শ্রেণীর প্রবন্ধের সঙ্গে অমীর খুজৌর কওল-খয়াল মিশ্রিত করে সৃষ্টি করেন 'চুটকলা খয়াল', যার প্রথম তুক ছিল রাগ-তাল আশ্রয়ী, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ তুকগুলি রাগাশ্রিত সুরে কবিতা পাঠের মতন ছিল। অর্থাৎ তাল ছিল না। কিন্তু বিস্তারে ফিক্রাবন্ধ অলংকার ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীকালে

'কওল্-বচ্চে' ঘরানার সংগীতগুণীরা ঐ চুটকলা-খয়ালের কবিতা পাঠের অংশটুকু বাদ দিয়ে তালে নিবদ্ধ প্রথম তুক বা স্থায়ী তুক অবলম্বনে সৃষ্টি করেন অন্তাঈ খয়াল [অর্থাৎ স্থায়ী বা আস্থায়ী খয়াল]। কোনো কোনো উস্তাদ এই শ্রেণীর খয়াল্েক শুদ্ধ বা শুধ্ খয়াল বলে থাকেন।[৬]

বর্তমানকালে সকল সংগীত ঘরানায় খেয়াল গান গাওয়া হয়ে থাকে। সমকালীন রাগ সংগীতের শাখা সমূহের মধ্যে খেয়াল এর স্থান সর্বপ্রথমে রয়েছে।

খেয়ালের নাম এবং উৎপত্তি নিয়ে নানা ধরনের মতবাদ প্রচলিত আছে। যেমন:

খেয়ালের উৎপত্তি

১. আরবি খেয়াল শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা, খুশি। অনেকে মনে করেন, ধ্রুপদের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে এই ধারার গানে স্বাধীনভাবে রাগের নানা রূপচিত্র নির্মাণ করার স্বাধীনতা আছে, এই অর্থে খেয়াল শব্দটি এসেছে।

২. দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কাওয়াল নামক যাযাবর সম্প্রদায় যে ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করতো, তার নাম ছিল কাওয়ালী। এই কাওয়ালী থেকে খেয়াল গানের উদ্ভব এবং নামটিও এসেছে কাওয়ালী শব্দ থেকে।

৩. প্রাচীন কৈবাড় নামক প্রবন্ধগান বা একতালী (রসিক গান) থেকে খেয়ালের উৎপত্তি ঘটেছিল।

খেয়ালের বাণী অংশ দুটি স্তবকে গঠিত হয়। এর প্রথমাংশকে স্থায়ী এবং দ্বিতীয়াংশকে অন্তরা বলা হয়। পূর্ণাঙ্গ খেয়াল পরিবেশনে, প্রথমে সংক্ষেপে আলাপ করা হয়। এরপর কোনো তালের বিলম্বিত লয়ে একটি গান করা হয়। এতে থাকে রাগের দীর্ঘ বিস্তার, নানা ধরনের তান এবং নানা ধরনের আলঙ্করিক উপাদান। দ্বিতীয় স্তরে দ্রুত লয়ের গান উপস্থাপন করা হয়। এই অংশে বিস্তারের চেয়ে তানের প্রাধান্য থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোটো খেয়ালে বিস্তারের পর লয় বাড়িয়ে তান অংশ করা হয়। শেষের দিকে যথাসম্ভব লয় বৃদ্ধি করে দ্রুত তান করা হয়। অনেকে ছোট খেয়ালের ভিতর তবলা বাদকের সাথে সওয়াল-জবাব নামক অংশ পরিবেশন করে ভিন্নতর রস উপস্থাপন করেন। "খেয়ালের অনুষঙ্গী তাল যন্ত্র হলো তবলা। এই গানের সাথে একতাল, ত্রিতাল, ঝুমরা ইত্যাদি তাল ব্যবহার করা হয়। তবে খেয়াল গানে তবলা শুধু অনুষঙ্গী নয়। কখনো কখনো তবলাকে প্রধান বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাজানোর সুযোগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে খেয়াল গায়ক বিশ্রাম নেন বা তবলা বাদককে তাল নির্দেশ দেন। তবলা বাদক এই সময়ে নানা রকম বাদনশৈলী প্রদর্শন করে থাকেন।"[৭]

খেয়াল গানের বৈশিষ্ট্য

১. পারসিক খেয়াল শব্দের আভিধানিক অর্থ কল্পনা বিশেষ।

২. খেয়ালের তাল ও ভাষা ধ্রুপদ অপেক্ষা হালকা হয়ে থাকে।

৩. খেয়াল গানে সাধারণত ত্রিতাল, একতাল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

৪. খেয়াল গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এতে তান, বোলতান, সরগম সহযোগে গীত হয়।

৫. বিস্তার হচ্ছে রাগ রূপের স্বাধীন সুরকর্ম। খেয়ালের শুরুতে নাতিদীর্ঘ আলাপ করার প্রচলন এখানে সর্বত্র। যদিও পূর্বে এটি ছিলো না।

৬. মূলত খেয়ালের সৌন্দর্য্যের বহিঃপ্রকাশ হয় আলাপ, বন্দিশ বিস্তার ও তানে।

৭. খেয়াল গানের লয় সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে। যথা: বিলম্বিত খেয়াল, মধ্যম লয়ে খেয়াল ও দ্রুত খেয়াল।

৮. খেয়াল গানের বিস্তারই প্রধান। তবে এর গতি চঞ্চল। এই গানের সাথে পাখোয়াজ অপেক্ষা হালকা তালযন্ত্র তবলা সংগত করা হয়ে থাকে।

৯. ঝাপতালের খেয়ালকে বলে সাদ্রা।

১০. খেয়ালে সাধারণত দুই তুকের একটি বন্দিশ থাকে। খেয়াল সাধারণত দুই প্রকার যথা–

ক. বড় খেয়াল

খ. ছোট খেয়াল।

দেবব্রত দত্ত বড় খেয়াল আর ছোট খেয়ালের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেতে গিয়ে বলেন–

বড় খেয়াল	**ছোট খেয়াল**
বড় খেয়ালকে বিলম্বিত খেয়াল বলা হয়।	ছোট খেয়ালকে দ্রুক খেয়াল বলা হয়।
এই শৈলীর গানের প্রকৃতি এবং গতি শান্ত এবং ধীর। বিলম্বিত একতালা, ঝুমুর, তিলুয়াড়া, বিলম্বিত ত্রিতাল, আড়াচারতালা ইত্যাদি তালে নিবন্ধ করিয়া গাওয়া হইয়া থাকে।	এই শৈলীর গানের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত চঞ্চল। দ্রুত-ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতালা ইত্যাদি তালে বদ্ধ করিয়া গাওয়া হইয়া থাকে

৮

খেয়ালাঙ্গের গান বিশ্লেষণ

আজি এ ভারত লজ্জিত হে,

আজি এ ভারত লজ্জিত হে,

হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে॥

নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা, সত্যসাধনা

অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে সকলই ব্রহ্মবিবর্জিত হে॥

ধিক্‌কৃত লাঞ্ছিত পৃথপরে, ধূলিবিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে

রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে করো তারে সহসা তর্জিত হে॥

পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,

পুণ্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে হইবে পলকে সজ্জিত হে॥

[প-ক্ষপা গা রা] ।

।। সা -া সা সা। { সা-া সা সন্া । ধ্া - ন্ধ্া ন্া ধ্া । সা -রা-গা (-মা । গা রা সা) }।-া ।

আ ০ জি এ ভা ০ র ত০ ল ০জ্ জি ত হে ০ ০ ০ ০ আ জি এ ০

। গা-পা পা পা । পা -ক্ষপা গা - া । গা-া রা সা । সা-রা -গা -ধা। [] ।

হী ০ না তা প ঙ্ কে ০ ম জ্ জি ত হে ০ ০ ০

[পক্ষা- পা

।। { গা -া গা -া । ধপা -া পা ধা । ধা -র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্সা র্সা ।

না ০ হি ০ পো০ উ রু ষ না ০ হি বি চা ০ র ণা

। র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা -না না -ধা । ধা -র্সা র্সনা ধা । -না ধা পা -া } ।

ক ঠি ন ত প স্ সা ০ স ত্ ত০ সা ০ ধ না ০

। পা ক্ষপা গা গা । গা গা রা -া । রা -া গা -া । পা -া ধা -া ।

অ ন্ ত রে বা হি রে ০ ধ র মে ০ ক র মে ০

।র্সা র্সা র্সা র্রা।র্সরা -র্গা র্রা র্সা।র্সনা -র্সা ধা পা । সা -রা -গা -ধা।[]।
স ক লি ০ ব্র০ ০ ক্ষ বি ব০ ব্ জি ত হে০ ০ ০

।।গা -া গা গা । পা -া পা পা । পা -া পা পা । পা -া -া -গা ।
ধি ক্ কৃ ত লা ন্ ছি ত পৃ ০থ্বী প রে ০ ০ ০

। গা -া গা গরা । গা -ধা পা ঋপা ।গা -রা গা রা । সা -া -া -া ।
ধু ০ লি বি০ লু ন্ ঠি ত সু প্ তি ভ রে০ ০০০

।{ সা -া সা সন্া । ধ্া -ন্া ধ্া প্া । প্া -সা সা সা । সা -া সা -া ।
রু দ্ রো তো০ মা ০ র নি দা ০ রু ণ ব জ্ রে ০

।সা রা গা পা । পা ধা ধা -র্সা । র্সা -া র্রা না । র্সা -া -া -া}।
ক রো তা রে স হ সা ০ । ত র জি ত হে ০ ০ ০

।গা -া গা গা । পা -া পা ধা । ধা র্সা র্সা -নর্সরা । র্সা -া র্সা -া ।
প র্ ব তে প্রা ন্ ত রে ন গ রে ০০০ গ্রা ০ মে ০

।র্সা –া র্গা র্রা । র্গা –া র্পা র্পা । র্গা –া র্রা র্রা । র্রনা -র্রা র্সা –া ।
জা গ্ গ্র ত ভা ০ র ত ব্র ০ ক্ষে র না০ ০ মে ০

।র্সর্সা –া ধা –া । পপা –া গা –া । রা গা পা –া । পা ধা ধা -র্সা ।
পু০ ণ্ ণে ০ বী০ র্ যে ০ অ ভ য়ে ০ অ মৃ তে ০

।র্সা র্রা র্সর্রা -র্গা । র্রা র্রা র্সা –া। র্সা -নর্সা ধা পা । সা -রা -গা -ধা ।।[] ।।
হ ই বে০ ০ প ল কে ০ স ০জ্ জি ত হে ০ ০ ০ [৯]

এ গানটির স্বরবিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গানটি মূলত ভূপালী রাগাশ্রিত। তাই ভূপালী রাগের সামান্য পরিচয় নিচে উল্লেখ করা হলো।

রাগ ভূপালী

রাগ ভূপালীকে ভূপ নামেও অভিহিত করা হয়। এটি একটি হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় রাগ। কল্যাণ ঠাঁটের অন্তর্গত। এতে আরোহণ অবরোহণে পাঁচটি করে স্বর ব্যবহৃত হয়। এ রাগে নিবদ্ধিত বেশিরভাগ গান মূলত ভক্তিমূলক হয়। দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্নাটকী শাস্ত্রীয় সংগীতে ভূপালী রাগ, রাগ মহানাম ও রাগ মোহন নামে পরিচিত। ভূপালীর আলাপ শান্ত এবং কোমল আবহ তৈরী করে। শুদ্ধ গ এর সরল এবং দ্রুতাঘাতের অনুরণন একত্রে যোগ হয়ে মানুষের মনে নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করে। ধ্যান বা মেডিটেশনাল মিউজিক কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে ভূপালীর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ভূপালী রাগের ক্ষেত্রে ধ কে ন্যাস স্বর হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না এবং খুব বেশি প্রাধান্য দিয়ে দেখানো যাবে না। ধ এর প্রাধান্য বেশি হলে ভূপালী রাগ দেশকারে পরিণত হবে কারণ দেশকারের স্বর কাঠামো ভূপালীর অনুরূপ। ন্যাস স্বর হিসাবে র ব্যবহার হয়। গ এবং ধ এর সঠিক মাত্রার প্রয়োগ ভূপালীর অন্যতম অনুষঙ্গ।

আরোহণ- স র গ প ধ র্স

অবরোহণ- র্স ধ প গ র স

বর্জিত স্বর- ম ও ন

জাতি- ঔড়ব-ঔড়ব

অঙ্গ- পূর্বাঙ্গীয় (মধ্য এবং মন্দ্র সপ্তকে বিস্তার বেশি)

পকড়- গ র গ, প গ, ধ প, প গ র স, গ র স

ভূপালী রাগে মা ও নি বর্জিত স্বর কিন্তু কবি গানের সুরে শুদ্ধ নিষাদ, শুদ্ধ মধ্যম ও কড়ি মধ্যম এর ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বিশ্লেষিত গানে দুইটি বর্জিত স্বর এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

অপরদিকে গানটিতে ২য় পংক্তিতির স্বর প্রয়োগে ভূপালী রাগের চলন অখণ্ড রেখেছেন।

২য় লাইন থেকে ১ম লাইনে প্রত্যাবর্তনের সময় সুরের পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে ভূপালী রাগ বহির্ভূত কড়ি মধ্যমকে আগন্তুক স্বর হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে। পাক্ষাপাগারে সানিধাণি. . . .ইত্যাদি।

অন্তরাতে 'নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা' অংশে ভূপলী রাগরূপ গাধাপা,পাধার্সা অক্ষত থাকলেও 'কঠিন তপস্যা সত্য সাধনা' অংশে শুদ্ধ নিষাদের প্রয়োগ আমাদের প্রাচীন বাংলার প্রচলিত বিভাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। র্সা, র্সানি নিধা, ধানিধা, নিধাপা।

অন্তরার শেষ পংক্তিতে পূনরায় ভূপালী রাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্লেষিত গানের প্রথম পংক্তিতে ভূপালী রাগ পুরোপুরিভাবে রক্ষিত হলেও দ্বিতীয় পংক্তিতে শুদ্ধ নিষাদের প্রয়োগে সুর-বৈচিত্র্য বিশেষভাবে মূর্ত হয়েছে।

আমাদের বিশ্লেষিত গানটির আভোগে অর্থাৎ গানের শেষ স্তবকে ভূপালী রাগের ব্যবহার পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে 'জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে' এর অংশে নামে'র সুর প্রয়োগে আমাদের ইমন-ভূপালী রাগের কথা মনে করিয়ে দেয়।

রামপ্রসাদ সেন (১৭১৮ - ১৭৭৫)

বাংলা ভক্তিগীতি, বিশেষ করে শ্যামা সংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার রামপ্রসাদ সেন (১৭১৮ -১৭৭৫) চব্বিশ পরগনা জেলার কুমারহট্টে পিতা রামরাম সেনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স থেকে তিনি সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, ফরাসী নানা ভাষা জানতেন। বাবার মৃত্যুর পর কলকাতায় এসে এক জমিদারের সেরেস্তায় মুহুরীর চাকরী নিয়েছিলেন এবং সে সময় থেকে তাঁর মাঝে শ্যামা সাধনার প্রভাব প্রগাঢ়ভাবে লক্ষ্য করা যায়। আর এ শ্যামা সাধনার প্রকাশ স্বরূপ তিনি শ্যামাসংগীত রচনা শুরু করেন । এমনকি কাজের মধ্যে থেকেও গান রচনায় তাঁর মন পড়ে থাকত। রামপ্রসাদ সেনের লেখা "আমায় দাও মা তবিল দারী"। গানটি জমিদারের নজরে পড়লে তিনি রামপ্রসাদকে ডেকে উৎসাহ দেন এবং গান রচনায় যাতে পুরোপূরি মনযোগী হতে পারেন সেই লক্ষ্যে তাঁকে চাকরী থেকে অব্যাহতি দিয়ে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন তখন থেকে শ্যামা সংগীত রচনায় আরো মনোনিবেশ করলেন রামপ্রসাদ, সৃষ্টি হল একের পর এক অমর রচনা "রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত"। রামপ্রসাদী গানে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ-রাগিনীর সাথে মহামিলন ঘটেছে পাঁচালী, ভাঙা কীর্তন সহ

বাংলার লৌকিক সুরগুলির। এই প্রকার গানের গায়নশৈলীতে এমন এক বিশেষ ঢঙ রয়েছে যা অন্যান্য সকল ধারার গান থেকে এই সংগীতধারাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। সুর-বৈচিত্র্য আর ভাব ও ভক্তিরসের সম্মিলনে এই গান স্বাতন্ত্রতা পেয়েছে "রামপ্রাসদী গান" বা "প্রসাদী সুর" নামে। গানের সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই ঢং বাংলা গানের ধারায় জনপ্রিয় হয়ে আছে। এই রামপ্রসাদী গান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশকিছু ভাঙা গান রচনা করেছিলেন।

রামপ্রসাদের গানগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. উপমা বিষয়ক

২. সাধনা বিষয়ক

৩. তত্ত্ব, দর্শন ও নীতি বিষয়ক

সুর স্বার্থক সংগীত বিনির্মাণের মহোত্ত্বম সম্পদ। রবীন্দ্র সংগীত রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠার পেছনে সুরের সার্থক প্রযোগ শৈলীর অবদান অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে করুণাময় গোস্বামী বলেন–

> ... বিষয়ের দিক থেকে তাঁদের গান সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন গত শতাব্দীর নিধুবাবু। তিনি বাংলা ভাষার টপ্পা গানের প্রবর্তক। বহু উৎকৃষ্ট বাংলা টপ্পা গানের রচয়িতা। সেই গানের প্রভাব সমস্ত ঊনবিংশ শতকের বাংলা গানে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বিষয়ের দিক থেকে তাঁর গানগুলো সবই ছিল একই আদর্শের বিরহ বেদনার গান। বাংলার প্রাচীন কীর্তন গানে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার বৈচিত্র্যই কেবলমাত্র প্রকাশ পেয়েছে। শাক্তরা প্রচার করে গেলেন আর এক ধরনের ভক্তির গান। ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দী ধ্রুপদ খ্যালের ভঙ্গিতে বাংলা ভাষায় বহু উপাসনার গান রচিত হল। গুরুদেবের সমসাময়িক বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা বাংলা গানে বৈশিষ্ট্য এনেছিলেন এবং খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল ইসলামের নামই আমি করব। এঁরা সকলেই একাধিক বিষয় নিয়ে গান রচনা করেছেন। তবুও দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশী ও হাসির গানের কবিরূপে যতটা খ্যাতি পেয়েছিলেন ঠিক সেই খ্যাতি প্রেম বা ভক্তির গান লিখে পাননি। অতুলপ্রসাদের ভক্তি ও প্রেমের গানই বাঙালিকে মুগ্ধ করেছে বেশি। নজরুলের কয়েকটি উদ্দীপক গান ও উর্দু গজলের আদর্শে রচিত প্রেমের গানগুলিই লোকপ্রিয় হল,অন্যগুলি তেমন স্থান পেল না জনসাধারণের মনে। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে গুরুদেবের গান বহুমুখী।[১০]

বর্তমান বিশ্লেষিত গানটি রবীন্দ্রনাথের এক অনুপম সৃষ্টি। প্রচলিত রামপ্রসাদী সুর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এ গানটি সৃষ্টি করেছেন। বলে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথ এ গানটি ছাড়াও উক্ত সুরে বেশকিছু গান বেঁধেছেন।

গান

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে?।
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে 'আয়' ব'লে ওই ডেকেছে কে,
সেই গভীর স্বরে উদাস করে-- আর কে কারে ধরে রাখে?।
যেথায় থাকি যে যেখানে বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে-- সেই প্রাণের বেদন জানে না কে?।
মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে--
সেই নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে ॥
কত দিনের সাধনফলে মিলেছি আজ দলে দলে--
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মাকে ॥

গা গা।। { গা [গা]পা -মগা । -রসা সা রা । গা গা -া । মা পা –া
আম্ রা মি লে ০ ০০ ছি আজ মা য়ে র ডা কে ০

। ধা র্সা –া । র্সা র্সা –া । র্সা র্সা –া । র্সা না -র্সনা ।
ঘ রে র হ য়ে ০ প রে র ম ত ০ন

। ধনা -র্সরা র্রা। র্সা না -র্সনা -। ধনা পা -ধপা । মধা পা –।[ম] ।।
ভা০ ০ই ছে ড়ে ভা ০ই ক০ দি ০ন থা০ কে ০

।। { পা ধা –া । ধা ধা –া । র্সা র্সা –া । না ধনা -ধপা ।
প্রা ণে র মা ঝে ০ থে কে ০ থে কে০ ০০

। না -া না । র্সা র্রা -র্গর্রা । র্সা র্সনা -ধনর্সর্রা। (র্সা র্সা-া)}। র্সা র্সা ধা।

' আ য়ব লে ও ০ই ডে কে০ ০০০ ছে কে০ ছে কে সেই

। ধা র্সা -া । র্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া । র্সা না -র্সনা ।

গ ভী র্ স্ব রে ০ উ দা স্ ক রে ০০

। ধা -ধনা র্সরা । র্সা না -র্সনা । ধনা পা -ধপা । মধা পা –া[ম] ।।

আ ০র কে০ কা রে ০০ ধ০ রে ০০ রা০ খে ০

।। { পা ধা –া । ধা ধা –া । র্সা –া র্সা । না ধনা -ধপা ।

যে থা য় থা কি ০ যে ০ যে খা নে ০০

। না না –া । র্সা র্রা –র্গর্রা । র্সা র্সনা –ধনর্সর্রা । (র্সা র্সা –া)} । র্সা র্সা ধা ।

বাঁ ধ ন আ ছে ০০ প্রা ণে০ ০০০ প্রা ণে ০ প্রা ণে সেই

। ধা র্সা –া । র্সা র্সা –া । র্সা র্সা –া । র্সা না র্সনা।

প্রা ণে র টা নে ০ টে নে ০ আ নে সেই

। ধা ধনা -র্সর্রা । র্সা না –র্সনা । ধনা পা –ধপা । মধা পা –া[ম]

প্রা ণে০ র বে দ ০ন্ জা০ নে ০০ না০ কে ০।

।। { পা –ধা ধা । ধা ধা –া । র্সা র্সা –া । না ধনা –ধপা ।

মা ন্ অ প মা ন গে ছে ০ ঘু চে০ ০০

। না না –া । র্সা র্রা –র্গর্রা । র্সা র্সনা –ধনর্সর্রা । (র্সা র্সা –া) } । র্সা র্সা ধা ।

ন য় ০ নের জ ০ল গে ছে ০০০ মু ছে--০ মু ছে সেই

। ধা র্সা –া । র্সা র্সা –া । র্সা র্সা –া । র্সা না –র্সনা ।

ন বী ন আ শে ০ হৃ দ য় ভা সে ০০

। ধা ধনা -র্সর্রা । র্সা না –র্সনা । ধনা –পা ধপা । মধা পা –া[ম] ।।

ভাই য়ে০ ০র পা শে ০০ ভা০ ই কে০ দে০ খে ০

।। পা ধা –া । ধা ধা –া । র্সা র্সা –া । না ধনা –ধপা ।

ক ত ০ দি নে র সা ধ ন্ ফ লে ০০

। না না –া । র্সা র্রা –র্গরা । র্সা র্সনা – ধনর্সর্রা । (র্সা র্সা –া)} । র্সা র্সা র্সা।

মি লে ০ ছি আ ০জ দ লে০ ০০০ দ লে ০ দ লে আজ্

। ধা র্সা –া । র্সা র্সা –া । র্সা র্সা –া । র্সা না –র্সনা ।

ঘ রে র্ ছে লে ০ স বা ই মি লে ০ ০

। ধা ধনা –র্সর্রা । র্সা না –র্সনা । ধনা –পা ধপা । মধা পা –া[ম] ।। ।।

দে খা০ ০০ দি য়ে ০০ আ০ য়্ রে০ মা০ কে ০ ॥[১১]

বিশ্লেষণের জন্যে নিচে রামপ্রসাদের বহুল জনপ্রিয় গানের স্বরলিপি উপস্থাপন করা হলো।

০ ৩

।।{ গা গমা পমা । -গরা সা রা ।

মা য়ে০ ০০ ০র্ এম্ নি

১ ২ ॥ ০ ০

। গা গঃমঃগঃ -রগা । মা পা (া-)} । পধা । ধা র্সা -া । র্সা র্সা -া ।

বি চা০০ ০র্ ব টে ০ যেজন্ দি বা ০ নি শি ০

। র্সা -া র্সা । না না -র্সনা । ধনা -র্সরা র্রা । র্সা না র্সনা

দু র্ গা ব লে ০০ তা০ ০র ক পা লে ০০

। ধনা পা -ধপা । মধা পা -মগা ॥

বি প ০দ্ ব টে ০০

০ ৩

॥ {-া -া পা । ধা ধা ধা ।

০ ০ হু জু রে তে

১ ২

। পধা -নর্সা র্সা । র্সা না র্সনা । পনা না ধনা । র্সা র্রা -া ।

আ০ ০র্ জি দি য়ে মা০ দাঁ ড়া য়ে আ ছি ০

। র্সা র্সা -ধর্সা । র্সা র্সা (-া)} । পধা । ধা র্সা র্সা । র্সা র্সা -া ।
ক র ০০ পু টে ০ কবে আ দা ল তে শু ০

। র্সা র্সা র্সা । না না -র্সনা । ধনা -র্সর্রা র্রা । র্সা না -র্সনা ।
না নি হ বে মা ০০ নি০ ০স্ তার্ পা বি ০০

। ধানা পা ধপা । মধা পা র্মগা । ॥
এ০ স ০ঙ্ ক০ টে ০০

।।{ -া -া পা । ধা ধা ধা ।
০ ০ সাও য়াল্ জ বাব্

১ ২
। ধনা -র্সরা র্সা । না ধা -নধা । -পা -া র্সা । না র্সা র্রা ।
ক০ ০র্ বি কি মা ০০ ০ -া বুদ্ ধি নাই কো

। র্সা র্সা -ধর্সা । র্সা র্সা (-া)} । পধা । ধা র্সা র্সা । র্সা র্সা -া ।
আ মা ০র্ ঘ টে ০ ওমা ভ র সা কে ব ল্

। র্সা র্সা -া । না ঠ -র্সনা । ধনা -র্সর্রা র্রা । র্সা না -সর্না ।
শি ব ০ বা ০ কে০ ঐ০ ০০ কা বে দা ০০

। ধানা পা -রপা । ধধা পা র্মগা । ॥
গ০ মে ০০ র০ টে ০০

গানটি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি রামপ্রসাদের সুর থেকে প্রভাবিত হয়ে বিশ্লেষিত গানটিতে সুরারোপ করেছেন।

কীর্তন

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা লোকসংগীতের শত সহস্র ধারা বহমান। আর এইসব ধারার মধ্যে যে কয়টি আদিতম ধারা এখন পর্যন্ত জীবন্ত, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কীর্তন। আমরা অবগত যে এ ধারা বাংলা সংগীত বা গীতধারা সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ হয়ে থাকে ঈশ্বর সাধনার জন্য। ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরকে পাবার আকুল আবেদন চলে কীর্তনের সুরের মূর্চ্ছনায়। গানের মাধ্যমে ঈশ্বর সাধনার স্বার্থক উত্তরসূরি হলো কীর্তনগান। কীর্তনের অর্থ মূলত বিশেষ্য পদ, যার অর্থ দাড়াঁয় গুণবর্ণনা, ঈশ্বরলীলা কথন, ঈশ্বর গুণগান ইত্যাদি। অর্থাৎ এই গানে মূলত ঈশ্বরের গুণ ও লীলা বর্ণিত হয়। সাধারণ অর্থে কীর্তন দুই প্রকার। যথা–

১. নামকীর্তন বা নামসংকীর্তন

২. লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন।

কীর্তন বাংলা গানের এমন এক ধারা যে ধারা লোকসংগীতের বেশকিছু ধারাকে প্রভাবিত করেছে। বলাবাহুল্য বাংলার অনেক গীতিকবি উক্ত ধারায় প্রভাবিত হয়েছেন। কীর্তন শ্রোতাদের সামনে বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। উপস্থাপন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে কীর্তনের ভাবগুলোকে অঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। গবেষক ও কীর্তনীরা এই অঙ্গগুলোকে মূলত পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। এই ভাগগুলো হলো-

> কথা : কীর্তনের বাণীকে সাধারণভাবে কথা বলা হয়। কথা হলো লীলা-কীর্তনের ভিত্তি। এই কারণে কথা-কে অনেক সময় মূল কীর্তন বলা হয়।
>
> দোঁহা : কীর্তনের এই অঙ্গে কীর্তনের বিষয়কে আবৃত্তি করা হয়। এর ভিতর দিয়ে কীর্তনে বৈচিত্র্যতা প্রকাশ পায়। এবং দীর্ঘ সময় ধরে কীর্তন পরিবেশনের সময়, শ্রোতা একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পায়।
>
> আঁখর : কীর্তনের ভাবকে সহজভাবে সুর-তাল সহযোগে ব্যাখ্যা করার একটি প্রক্রিয়া। মূলত কীর্তনিয়া এই অঙ্গে তাঁর নিজের অভিমত ব্যাখ্যা সহযোগে জানিয়ে দেন। এর ভিতর দিয়ে কীর্তনীয়া তাঁর প্রতিভার প্রকাশ ঘটানোর সুযোগ লাভ করেন।
>
> তুক : কীর্তনের কাব্যগীতি অংশ হলো তুক। এই অঙ্গে অনুপ্রাসযুক্ত, ছন্দোময়, অন্ত্যমিলযুক্ত পদ পরিবেশন করা হয়।
>
> ছুট : কীর্তনের কোনো পদকে সম্পূর্ণ পরিবেশন না করে, ছোটো ছোটো ছন্দে লীলায়িত ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়। এই অঙ্গটির মধ্যদিয়ে কীর্তনীয়ার ব্যক্তি পারঙ্গমতা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। [১৩]

রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গের গানের মাঝে কীর্তন গায়ন রীতির পাঁচটি অঙ্গ যথা: কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুটের মধ্য থেকে শুধুমাত্র আখরকে রবীন্দ্র গায়নরীতিতে গ্রহণ করেছিলেন।

১. রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে কীর্তন সুরের গানগুলো রাধা-কৃষ্ণের প্রেম উপলক্ষ্য করে লিখলেও পরবর্তীতে লৌকিক প্রেমে ও সহজিয়া জীবনবোধ লক্ষ্যকরা যায়।

২. রবীন্দ্র সৃষ্ট কীর্তনাঙ্গের গানগুলোর সুর তুলনামূলভাবে সহজ ও সরল।

৩. কীর্তন গানের মধ্যে বহির্জগতের কলকোলাহল নয় বরং অন্তরে শান্ত সমাহিত ভাব জাগ্রত করে।

৪. বাংলা কীর্তনের সুর ও ছন্দের সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের সৃষ্ট গানগুলোর সাদৃশ্যতা বিদ্যমান।

৫. গানগুলোর ভাষা ও সুরের সামঞ্জস্য শ্রোতার চিত্তকে আকর্ষণ করে।

৬. রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গের গানের সঙ্গে বাংলার পূর্বপ্রচলিত কীর্তনের মধ্যে বিশেষ বৈসাদৃশ্য হলো কীর্তন গানে তালবৈচিত্র্যের বহুমাত্রীকতা দেখা গেলেও রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গের গান তিন বা চারটি তালে বাঁধা।

৭. রবীন্দ্রনাথের কীর্তন গানে ঈশ্বরানুভূতি কেবল ভক্তি নয়, অন্তর উপলব্ধি ও আত্মোপলব্ধি বিদ্যমান।

৮. রাবীন্দ্রিক কীর্তনের একটি বিশেষ অঙ্গ 'আখর'। যা তিনি বলেছেন 'কথার তান।' তানে যেমন সুরের বিস্তার, আখরে তেমনি কথার বিস্তার।

গান

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥

।। মা –পা পা । –া পা পধপা । মা –পধা পা । -মগা গা -মা ।
বা ঙ লা র্ মা টি০০ বা ০ঙ লা র জ ল

।। মা –পা পা । –া পা পমা । পা –ধা পধা । -না না -ধপা ।
বা ঙ্ লা র্ বা য়ু০ বা ঙ্ লা০ র্ ফ ০ল্ ।

। পা -ধর্সা র্সা । র্সা র্সা –া । নর্সা -র্রর্গা র্রা । র্সা র্ঁ র্রর্সা -না ।
পু ০ণ্ ণ হ উ ক পু০ ০ণ্ ণ হ উ০ ক

। { ধনা -র্সা না । না ধনধা -পা । ক্ষা -পক্ষ গা । ক্ষা পা –া ।।
পু০ ণ্ ণ হ উ০০ ক হে ০০ ভ গ বা ন্

।।{ধা -নর্সা না। –ধপা পা -ধা। ধ না না । -া না -া।

বা ঙ লা ০র ঘ র্ বা ঙ্ লা র হা ট্

।নর্সা -া র্সা । -না র্সা -র্রা ।র্সা -র্রর্গা -র্রা। র্সা না (-নর্সনা)} । -নধপা।

বা ঙ লা র্ ব ন বা ০ঙ্ লা র্ মা ০০ঠ্ ০০ঠ্

। পা -ধর্স র্সা । র্সা র্সা -া । নর্স -র্রর্গা র্রা । র্সা র্সর্রর্সা -না ।

পূ ০র ণ্ হ উ ক্ পু০ ০র ণ গ উ০০ ক্

। নি -ধনর্স না । না ধনধা -পা । ক্ষা -পক্ষা গা । ক্ষা পা -া ।

পূ ০০র ণ্ হ উ০০ ক্ হে ০০ ঋ গ বা ন্

॥ {ধা -নর্স না । ধপা পা -ধা । ধা না না । -া না না ।

বা ঙা০ লি ০র প ণ্ বা ঙা লি র্ আ শা

॥ ঁসা র্সা র্সা । -না র্সা -র্রা । র্সা র্রর্গা র্রা । -র্সা না (নর্সনা)} । নধপ ।

ঊা ঙা০ লি র্ কা জ্ বা ঙা০ লি র্ ভা০০ ষা০০

॥ পা -ধর্সা র্সা । র্সা র্সা -া । নর্সা -র্রর্গা র্রা । -র্সা র্সর্রর্সা -না ।

স ০ত্ ত হ উ ক্ স০ ০ত্ ত হ উ০০ ক্

॥ নি -ধনর্সা না । না ধনধা -পা । ক্ষা -পক্ষা গা । ক্ষা পা -া ॥

স ০ত্ ত হ উ০০ ক্ হে ০০ ভ গ বা ন্

॥ {ধা নর্সা নি । -ধপা পা -ধা । ধা না না । -া না -া ॥

বা ঙা০ লি ০র্ প্রা ণ্ বা ঙা০ লি ও ম ন্

। র্সা র্সা র্সা । -না র্সা -র্রা । র্সা র্রর্গা র্রা । -র্সা না (নর্সনা)} । নধপ ।

বা ঙা লি র্ ঘ রে য ত০ ভা ই বো ০০ন্ ০০ন্

॥ পা -ধর্সা -া । র্সা র্সা -া । নর্সা -র্রর্গা -র্রা । -র্সা র্সর্রর্সা -না । ।

এ ০০ ক্ হ উ ক্ এ০ ০০ ক ঘ উ০০ ক্

॥ না -ধনর্সা না । না ধনধা -পা । ক্ষা -পক্ষা গা । ক্ষা পা -া ॥

এ ০০০ ক হ উ০০ ক্ হে ০০ ভ গ বা ন্

১৪

গানটিতে কীর্তনে বহুল ব্যবহৃত সহোই রাগের আভাস বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

“মাগামাপা, পাধানি পার্সানিধা, নিধাপা, পাধানিপাধামাপা।

র্সার্রেসার্মার্গার্রেগার্রে, র্সার্রেসানিধানিধাপা।

রেমা, গামাপাধা নিধা, পাধাপামাগারেমাগারে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সহোই রাগটি হিন্দুস্তানি সংগীত পদ্ধতি অনুযায়ী খাম্বাজ ঠাঁটের অন্তর্গত। উক্ত রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোর মধ্যে উভয় নিষাদসহ সবগুলো শুদ্ধ স্বরের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

অপরদিকে আলোচ্য গানটিতে কোমল নিষাদের ব্যবহার নেই। শুধুমাত্র এক স্থানে আগুন্তক স্বর হিসেবে কড়ি মধ্যম লাগানো হয়েছে। ক্ষাপাক্ষাগাক্ষাপ । সহোই রাগে কড়ি মধ্যেমের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে না থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে কির্তনীয়ারা গানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য পানিনিধাপা, ধাপা ধাপা ক্ষাপা ব্যবহার করে থাকে।

টপ্পা

ভারতীয় হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে টপ্পা একটি অন্যতম জনপ্রিয় সংগীতধারা। "টপ্পা হিন্দি শব্দ- আদি অর্থ লম্ফ, তাহা হইতে রূঢ়ার্থে সংক্ষেপ, এই সংক্ষেপত তাহার নাম টপ্পা"।[১৫] শাস্ত্রীয় সংগীতের কঠোর নিয়মকানুন পালনে সচেতন বিশেষ ধারার নাম ধ্রুপদ। আর এই কঠোর নিয়মের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে নতুন পথের উন্মোচন করেছিল খেয়াল গান। আর সেই ধারা থেকে মুক্তির নতুন পথ উন্মোচন করেছিল হিন্দুস্থানী সংগীতের বিশেষ ধারা 'টপ্পা'। যা ছিল মূলত স্বাধীনচেতা সাধকের গান। এর উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা সবচেয়ে বহুল প্রচলিত যে ধারণাটি আজ পর্যন্ত সর্বজন স্বীকৃত তা- হলো এর সৃষ্টি পাঞ্জাব অঞ্চলের উট চালকদের হাত ধরে। উট চালকরা তাদের উট নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বাণিজ্য করতে গেলে উটের পিঠে বসে নিজ মনোরঞ্জনের জন্য এক ধরনের গান গাইতেন। আর এই গানের বিষয়বস্তু ছিল প্রেম, ভালোবাসা, হৃদয়াবেগ, বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যাদি। তবে উট চালকরা উটের পিঠে বসে গাইলেও জনপ্রিয় এই ধারার গান সর্বপ্রথম আসর কেন্দ্রীক পরিবেশনার জন্য নিয়ে আসেন শোরী মিয়া। উল্লেখ্য শিল্পী শোরী মিয়ার পিতা গোলাম রসুল লক্ষ্ণৌর নবাব সুজা-উদ-দৌল্লার সভায় সভাগায়ক ছিলেন। সেই সূত্রে শিল্পী শোরী মিয়া নিজের পিতার কাছেই সংগীতশিক্ষা অর্জন করেন। কোনো একসময় শিল্পী শোরী মিয়া সেই উট চালানোর গানকে বাবার সাহায্যে নবাবের সভায় গাওয়ার সুযোগ পেলে তা তিনি গাইলেন এক ভিন্ন আঙ্গিকে। ফলে নবাব সেই গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর সেই ধারাবাহিকতায় সংগীতের অঙ্গনে জন্ম নেয় এক নবতর গানের শৈলী। আর এই জন্যই তৎকালীন টপ্পা গানের সাথে শোরী মিয়ার নাম এক হয়ে যায়। ফলে শোরী মিয়াকে টপ্পা গানের জনক বলা হয়।

বাংলা টপ্পা গান

নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা টপ্পা গানের রচয়িতা এবং গায়ক। প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত। নিধুবাবুর জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে তাঁর সময়ের এবং পরে অনেক লেখক তাঁর সম্পর্কে লিখে গেছেন বৈচিত্র্যময় তথ্য। তাঁদের মধ্যে "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বৈষ্ণবচরণ বসাক, জয়গোপালগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাপ্রসাদ দে, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, সুশীল কুমার দে প্রত্যেকেই তাঁর কবিত্বশক্তি এবং ভাষাজ্ঞানের প্রশংসা করলেও তাঁর জীবনের ঘটনাবলির পূর্ণাঙ্গ তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ দিতে পারেননি। পলাশীর যুদ্ধেরও ষোলো বছর আগেকার বাংলায় (১৭৪১ সাল) রামনিধি গুপ্তের জন্ম হয়"।[১৬]

তাঁর সৃষ্ট বাংলা টপ্পা গানের সূত্রে, তিনি নিধুবাবু নামে খ্যাত। পিতার নাম হরি নারায়ণ গুপ্ত। পেশায় তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন। তৎকালীন নানা রকম বর্গীর হাঙ্গামার জন্য বাস্তুভিটা ত্যাগ করে তাঁর পরিবার হুগলি জেলার চাপ্তা গ্রামে চলে আসেন। ঠিক ঐ বছর নিধুবাবু উক্ত গ্রামে মামা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ঐ অঞ্চলের নবাবের দ্বারা মারাঠীদের দমনের ফলে কলকাতা নিরাপদ হয়ে উঠলে, ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে হরিনারায়ণ কুমারটুলীতে ফিরে আসেন। কলকাতাতে তিনি শিক্ষাগ্রহন থেকে শুরু করে পরবর্তীতে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর নিধুবাবু ১৭৭৬ সালে রাজস্ব আদায় বিভাগে সরকারী চাকরিলাভ করেন। উক্ত বছরেই তিনি বিহারের ছাপরা জেলার কালেক্টর অফিসে দ্বিতীয় কেরানি হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি রাগসঙ্গীতের তালিম নেন। এর পর উক্ত জেলার রতনপুরের ভিখন রামস্বামীর মন্ত্র শিষ্য হলে তিনি উত্তরভারতের বিচিত্র সংগীত ধারার সাথে পরিচিতি লাভ করেন এবং লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে শোরী মিঞা'র টপ্পার সাথেও তাঁর পরিচয় ঘটলে, তিনি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে টপ্পা গান শেখেন। এই টপ্পা সংগীত শৈলীর প্রতি প্রবল আকর্ষণের ফলে তাঁর বাংলায় টপ্পা সৃষ্টির বাসনা জাগে। ধারণা করা হয় সেই থেকেই বাংলা টপ্পা গানের সৃষ্টি হয়। আর নিধু বাবুর প্রথম লিখিত টপ্পা গানটি

কামোদ- কাম্বারজ
জলদ তেতাল
নানান দেশে নানান ভাসা (ভাষা)
বিনে স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা?
কত নদী সরোবর
কি বা ফল চাতকীর।
ধারাজল বিনে কভূ ঘুচে কি ত্রিষা (তৃষা)? [১৭]

টপ্পা গানের বৈশিষ্ট্য

১. টপ্পা সুরের প্রকৃতিতে হাস্য, প্রেম, প্রণয়, আনন্দ, উল্লাস ও উদ্দীপনার ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

২. টপ্পা গানের বিষয়বস্তুতে মানব মানবীর প্রেম-বিরহ উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়।

৩. নিধুবাবু-রচিত গানে বিরহের প্রকাশ মার্জিত, পরিশীলিত।

৪. টপ্পার চলন দ্রুততার সাথে লাফিয়ে চলে এবং এ গান সংক্ষিপ্ত।

৫. টপ্পা গানে মাত্র দুইটি তুক থাকে যা হলো স্থায়ী এবং অন্তরা।

৬. এ গানে ব্যবহৃত রাগ সরল ও লঘুভাবোদ্দীপক।

৭. টপ্পা মূলত শৃঙ্গার রসাত্মক সুমিষ্ট গান। তাই এ গানে খাম্বাজ, পিলু, চৈতাগৌরী, কাফি, ভৈরবী, কালাংড়া, সিন্ধু, ঝিঁঝিট, বাঁরোয়া, দেশ প্রভৃতি রাগের ব্যবহার অধিক। এ রাগের মধ্যদিয়েই টপ্পার মিষ্টত্ব ফুটে ওঠে।

৮. টপ্পা গানের সুর সংযোজনায় এবং চলনে দ্রুত তান প্রয়োগ করা হয়।

৯. এর সাংগীতিক অলংকার 'জমজমা' শ্রেণির অন্তগর্ত।

১০. তান প্রয়োগ যদিও দ্রুত তবে স্তবকে সূক্ষ্ম গিটকারী সহকারে গড়িয়ে গড়িয়ে বিন্যাস করা হয়েছে।

১১. এ গান প্রেম বিরহ কেন্দ্রীক বলে এর সুরের মাঝে থাকে মায়াবী ছোঁয়া আর ভাব উদ্রেক ঘটাতে তানকে ফাঁকে ফাঁকে সাজিয়ে বিশেষ আবেশ তৈরী করা হয়।

১২. শাস্ত্রীয় খেয়ালের বেশকিছু তালই টপ্পায় ব্যবহৃতে দেখা যায় ।

১৩. টপ্পা গানে তানের কাজ মূলত সুরের অবরোহণে বেশি লক্ষ্য করা যায়।

১৪. গানের তাল ব্যবহারেও সুচিন্তিত চিন্তার ছাপ পাওয়া যায়। এতে প্রধানত পাঞ্জাবী ঠেকা, মধ্যমান, দ্বীপচণ্ডি প্রভৃতি তাল বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫. টপ্পায় দুই ধরনের তান ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন -

১। কিছু তান হালকা ও ক্ষুদ্র

২। কিছু তান দীর্ঘ ও দানাদার।

১৬. শুরুর দিকে টপ্পা হালকা মেজাজের গান ছিল তবে কালক্রমে টপ্পা গানে গুরুগম্ভীর ভাব ও বিষয়াদি যুক্ত হয়।

১৭. শোরী মিঞা টপ্পা গানের যে ধারা প্রচলন করেছিলেন তাতে মাধুর্য্যপূর্ণ গায়কী ছিলো । তালের যেখানে ঝোঁক পড়ার কথা এ গানের গায়কীতে সে জায়গায় আগে বা পরে ঝোঁক ফেলার চেষ্টা দেখা যায় সবসময়। যা আয়ত্ত করা গায়কদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের টপ্পা গানের বৈশিষ্ট্য

১. রবীন্দ্রনাথ শোরী মিয়া নয় রবং নিধুবাবুর টপ্পা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তবে ঠাকুরবাড়িতে হিন্দুস্থানী টপ্পার প্রচলন থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথ বেশকিছু গান রচনায় শোরী মিঞার টপ্পা অনুসরণ করেছিলেন।

২. রবীন্দ্রনাথ তাঁর টপ্পা গানে তান, বোলতানের ব্যবহার তেমন করেন নি।

৩. তিনি মূল টপ্পার জমজমার কাজ ও গিটকারীর কাজ খুবই অল্প ব্যবহার করেছিলেন।

৪. রবীন্দ্রনাথের টপ্পা অঙ্গের গানের মধ্যে বেশিরভাগ গান পূজা পর্যায়ের হলেও স্বার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে গানটি মূলত স্বদেশ পর্যায়ভূক্ত।

৫. রাগ ও তালের ক্ষেত্রে মূল গানের রাগ তাল ব্যবহার করেছেন।

৬. রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে টপ্পার চলন রেখেছিলেন বটে কিন্তু বাণীর ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন অনেক বেশি।

৭. টপ্পাঙ্গের গানের পাশাপাশি রচনা করেছিলেন বৈতালিক টপ্পা।

ভৈরবী রাগ :

ভৈরবী রাগ শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ বিশেষ। এ রাগটি ভৈরবী ঠাঁটের অন্তর্ভুক্ত। যার ৪টি স্বর কোমল ঋ(ঋষভ/রেখাব), জ্ঞ (গান্ধার), দ (ধৈবত), ণ (নিষাদ/নিখাদ) বাকী সব স্বর শুদ্ধ।

আরোহণ: স ঋ জ্ঞ ম প দ ণ র্স

অবরোহণ : র্স ণ দ প ম জ্ঞ ঋ স

পকড় : ঋ ণ্ দ্ স, জ্ঞ, স ঋ স ণ্ স

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম, মা গো তোমায় ভালোবেসে
জানি নে তোর ধন রতন, আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়, তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন বনেতে জানি নে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥

[	ণ্সাঋা	-জ্ঞমজ্ঞা	ঋা	।	গা	-া	সসা	।	সঋণ্া	-সঋজ্ঞ	রঃ]					
॥	সঋা	-জ্ঞা	ঋসা	।	ণ্দ্া	-া	ণ্সা	।	সরা	-জ্ঞাঃ	রঃ	।	জ্ঞমরা	-জ্ঞ	-া	।
	সা০	র্	থ০		ক০	০	জন		ম০	০	আ		মা০০	০	র্	
															॥	
।	দ্া	-া	ণ্সা	।	সারজ্ঞ	-া	মজ্ঞা	।	ঋজ্ঞাঋা	সা	-া	।	-া	-া	-া	।
	জ	ন্	মেছি		এ০০	০	০ই		দে০০	দে	০		০	০	০	

[জ্ঞমণদা -পদণা] ॥

। {সা -দা দা । পা -া পাপা । পাদপা -মপদণা -দপা । মপা মা -পামা} ।

সা র্ থ ক ০ জন ম০০ ০০০০ ০ মা০ গো ০০

। জ্ঞমা -া া । জ্ঞমা -জ্ঞমাপা এপা । জ্ঞমা জ্ঞা -া । ঋসা -ণ্সণ্া -দ্া । [ ] ।

তোমা ০ য় ভা০ ০০০ লো০ বে০ সে ০ ০০ ০০০ ০

॥ -া -া সদা । {দা দা ণা । ণর্সণা -দণর্সর্ঋ -র্জ্ঞর্ঋর্স । ণর্সা -া -া ।

০ ০ জা নি নে তোর্ ধন০ ০০০০ ০০০ রত ০ ন্

॥ -া -া ণা । {ণর্জ্ঞ র্ঋা র্সর্ঋা । ণর্সা -ণর্সর্ঋ -র্সর্ঋা । র্ণসা ণদণা -দা ।

০ ০ আ ছে০ কি না০ রানী ০০০০ ০র্ ম০ ত০০ ০

। -পা -া (পদা)} । সপা । পা পা পা । {মপা পা -া । পা -া পা ।

০ ন্ জা শু ধু জা নি আ মা র্ অ ঙ্ গ

। [ম]পা [ম]পা -জ্ঞা । জ্ঞা মপদণা -দপা । মপা মা -পমা । (জ্ঞ মা । জ্ঞা -ঋসণ্ ।

জু ঙা য় তো মা০০ ০র্ ছা০ য়া ০য়্ । এ০ সে ০০০

॥ {-া -া সা । সা সা রা । জ্ঞা মা জ্ঞদা । পা মা -া ।

০ ০ কোন বা নে তে জা নি ০০ । নে ফু ল্

। মপা -মা -জ্ঞা । রা জ্ঞাঃ মাঃ । জ্ঞঋা -সঋজ্ঞমা -জ্ঞঋজ্ঞা । ঋা সা -া } ।

গ০ ন্ ধে এ মন্ ক রে ০০০০ ০০০০ । আ কু ল্

। {-া -া সদা । দা দপা পা । পা পা -া । [ম]পা [ম]পা জ্ঞা ।

০ ০ কোন গ গ০ নে ও ঠে ০ । রে চাঁ দ্

। [র]জ্ঞা মপদণা -দপা । এপা মা -পমা । জ্ঞমা জ্ঞা -ঋসা । [-ণ]সা -া -া -া } ।

এ ম০০০ ০ন্ হা০ সি ০০ হে০ সে ০০ ০ ০ ০ ০

। -া -া সদা । {দা দা ণা । ণর্সণা -দণর্সর্ঋ -র্জ্ঞর্ঋর্স । ণা র্সা -া

০ ০ আঁ খি মে লে তোমা০ ০০০০ ০০র্ আ লো ০

। -া -া [স]ণা । ণর্জ্জা র্ঋা র্সর্ঋর্সা । ণর্সা -ণর্সর্ঋ র্ঋর্সা । র্সণা । -ণদণা -দা ।

০ ০ প্র থম্ আ মা০র্ চো০ ০০খ্ জু০ ড়া০ লো০০

। -পা -া ([স]দা)} । [ম]পা । পা পা পা । {পা পা । [ম]পা [ম]পা -জ্ঞ ।

০ ০ আঁ ওই আ লো তে ন য় ন রে খে

। মপা -দাণি দপা । মপা মা -পমা । (জ্ঞমা জ্ঞা -ঋসণ্া । -সা া -া ।

মু০ ০দ্ র০ ন০ য় ০ন্ শে০ ষে ০০০ ০ ০ ০

১৮

এ গবেষণার বর্তমান আলোচিত গানটি স্বরবিতান ষট্‌চত্বারিংশ নং খণ্ডের ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর প্রণীত স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে । স্বরলিপির আদিতে বা অন্তে রাগ বা তালের কোনো নির্দেশ নেই। কিন্তু স্বরলিপি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গানটি ত্রিমাত্রিক একতালে বাঁধা। বলে রাখা দরকার উক্ত গানটি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুক্ত ছন্দে গাওয়ার রীতি প্রচলিত। এ গানের সুরের চলন পর্যালোচনা করে প্রমাণিত হয় যে এখানে ভৈরবীর রাগরূপ পুরোপুরিভাবে রক্ষিত হয়েছে।

সারি :

আবহমান বাংলার লোকসংগীতের ধারায় অন্যতম একটি শক্তিশালী শৈলী হলো সারিগান। মূলত নৌকার মাঝিরা বৈঠার তালে তালে এই গান গেয়ে থাকে। তবে বলে রাখা দরকার অনেকেই ধারণা করেন সারিবদ্ধভাবে একত্রে কাজের মাঝে এই গান গাওয়া হয় বলে একে সারিগান বলে। সারিগান কাজের মাঝে গেয়ে থাকে বলে অনেকেই একে কর্মসংগীতও বলে থাকে। সারিগানের উদ্ভব সম্বন্ধে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসেবে কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে প্রথম সারিগানের উল্লেখ সংক্রান্ত মতবাদ উল্লেখযোগ্য। সেখানে সংগীতের সমার্থক শব্দ রূপে সারি শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। বলাবাহুল্য মধ্যযুগের এই মতবাদ থেকে ধারণা করা হয় সারিগান এর আগে থেকেই ছিল। তাছাড়া মোঘল বাদশাহদের আমলে নৌকাবাইচের প্রসার

ও প্রচার ঘটে। তখন থেকেই নৌকাবাইচের সময় সারিগান ব্যবহার করা হয়। বলাবাহুল্য আবহমান বাংলার এ লোকসঙ্গীতটি এখন শ্রমিকদের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাংলার মানুষের চিত্তবিনোদন ও প্রতিযোগিতামূলক খেলার উপাদানে পরিণত হয়েছে।

সারিগানের বৈশিষ্ট্য

১. সারিগান মূলত লোকসংগীত হলেও তাল রক্ষার ক্ষেত্রে এতে কর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। তাই এ গানে সমপদী তাল বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

২. সারিগান মূলত সমবেত কণ্ঠে পুরুষরা গেয়ে থাকে। তবে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ থাকলে তারাও গানে যোগ দেয়।

৩. সারিগানে মূলত একজনের দ্বারা গান পরিচালিত হয় অর্থাৎ এই গান গায়ন প্রধান গান। একজন শুরু করলে বাকিরা তালে তালে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে চলে।

৪. সারিগান অবস্থা ভেদে দ্রুত ও ধীর লয়ে গাওয়া হয়। যেমন– নৌকাবাইচের সময় নৌকা দ্রুত ছুটে চলে তাই তখন দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। তবে সাধারণত মাঝি-মাল্লারা নদীর বুকে দাঁড় টানার সময় ধীর লয়ে গেয়ে থাকে।

গান

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী॥

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী॥
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে, ভাই, ডাক দে আজি
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল সব দড়াদড়ি॥
দিনে দিনে বাড়ল দেনা, ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা
হাতে নাই রে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন করে
ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি॥

সঃ গা রা ॥ গপা পা পা নিঃ । পাঃ নিঃ ধা পা । ᵐপা মা গা রগা । সরগা গা গা রগরা

এ বার্ তোর্ ম০ রা গা ঙে বান্ এ সে ছে জয় মা ব লে০ ভা০০ গা ত রী০০

॥

। -সা -া -া । -প্সা -ঃসাঃ সা রা ॥

০ ০ ০ ০ ০০ ০"এ বার্ তোর

াঃ পঃ পা ধর্সা ॥ ᵛর্সা র্সা র্সা র্সা । ᵛর্রা র্সা না ধনধা । পাঃ ধঃ পা পা । গপা পা ধা নর্সনা ।

ও রে রে০ ও রে এ ঝি কো থায় মা ঝি০০ প্রাণ্ প ণে ভাই ডাক্ দে আ জি০

০

। -ধা -া -া -ণধা । পা -া -া পপা । পা ধা ᵛর্সা না । ধা পা ধা পা ।

০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ তোরা স বাই মি লে বৈ ঠা নে রে

। ᵐপ মা গা রগা । সরগা গা গা রগরা । -সা -া -া -া । -প্সা -ঃসঃ সা রা ॥

খু লে ফেল্ সব দ০০ ড়া দ ড়ি০০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০'এ বার্ তোর

-া -া -া -া ॥ {প্সা সা সা সরা । গপা পা পা মপমা । -গা -া -া গগা । গাঃ মঃ পা ধা ।

০ ০ ০ ০ দি০ নে দি নে বাড় ল দে না০০ ০ ০ ০ ওভাই কর্ লি নে কেউ

। পা মপা মা গা । -া -া -া সরা । গাঃ মঃ গা রগা । রা সা -া -া} ।

বে চা০ কে না ০ ০ ০ হাতে নাই রে ক ড়া০ ক ড়ি ০ ০ ০

পা ধর্সা র্সা র্সা । *র্রাঃ র্সঃ না ধনা । পাঃ ধা পা পা । রপা পা ধা নর্সনা ।

ঘা টে০ বাঁ ধা দিন্ গে ল রে মুখ্ দে খা বি কে০ মন্ ক রে০০

। -ধা -া -া -ণধা । -পা -া -া পপা । পাঃ ধঃ র্সা না ধাঃ পঃ ধা পা ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ওরে দে খু লে দে পাল্ তু লে দে

। ধা পা গা রগরা । সরগা গা গা রগরা । -সা -া -া -া । -প্সা -ঃসঃ সা রা ॥ ॥

যা হয় ঘ বে০০ বাঁ০০ চি ম রি০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০“এ বার্ তোরা

১৯

বলে রাখা দরকার গাটিতে স্বরলিপির সাথে সারিগানের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তারপরও গানের স্বর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গানটিতে শাস্ত্রীয় সংগীতের বিলাবল ঠাঁটের বিভাস রাগের আভাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ রাগের সাথে ঐতিহ্যবাহী বাংলা লোকসুরের সবিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। এ প্রসংঙ্গে সংগীত আচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর “রাগ অভিধান” গ্রন্থে বলেছেন–

> আমাদের এই বিভাসের আদিরূপটির যে সুর-প্রভাব আছে তাতে বেশ উপলব্ধি হয় রাঢ় ভূমের প্রকৃতির আবহাওয়ার সংগে তার ঘনিষ্ঠ মিলন সম্পর্কের কথা। এই অঞ্চলের বনানী এবং তার সম্মুখবর্ত্তী মৃত্তিকাবলীর যে দৃশ্য, তাতে মনে হয় যেন ধরিত্রীর বৈরাগ্যবিধুর তপস্বিনীর সেই মুক্তির কাছে আসার বাসনা নিয়ে প্রাতঃকালে বিভাসের সুর যেন সাধকের কণ্ঠে সমুপস্থিত হয়ে বলে আমাকে নিয়ে এখন তাঁকে ডাকো। অন্তরের এই আকর্ষণীয় প্রেরণা মূলক কথা, বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমের গ্রামপ্রান্তের দৃশ্যাবলীর সন্নিকটে ভাবানুরাগ নিয়ে বিচরণ না করলে উপলব্ধি হবে না।[২০]

গানটির প্রথম পংক্তির স্বরবিন্যাস

সারেগাপাধানিধাপা, পামাগারেসারেসারেসা,পামা। এ স্বরবিন্যাসে বিভাস রাগরূপের আভাস স্পষ্ট। তবে বলে রাখা দরকার অবরোহণে শুদ্ধ মধ্যম বিবাদী স্বর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্তরার স্বরবিন্যাস এরূপঃ পাধার্সারেঁর্সানিধা, পাধাপা, পাধার্সাণিধা, ণিধাপা, পাধাসাণিধাপাধাপ, পামাগারেসারেগা, গারেগাসাপ্সা।

বিশ্লেষিত গানটি রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত সারি অঙ্গের গান “মন মাঝি সামাল সামাল/ ডুবলো তরী/ ভব নদীর তুফান ভারী” গানটির সুর অনুসরণে সুরারোপ করেন।

সঃ	গা	রা	৷৷	গপা	পা	পা	পা	।	পাঃ	পা	না	ধা	পা	না	ধা	পা	।	ধা	পা	গা	রগা
												।									
মন	মা	ঝি		সা	০	মা	ল		সা	০	মা	ল	ডু	ল	ত	রী		ভ	ব	ন	দীর
													ব								

সরগা	গা	গা	গা	।	গা	রে	গরসা	ধ্সা
তু	০	ফা	ন		ভা	রী	০০০	০০০

নিজস্ব স্বরলিপি

আগে চল আগে চল ভাই

আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে, বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই! আগে চল্, আগে চল্ ভাই ॥
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়, দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়--
'সময় সময়' ক'রে পাঁজি পুঁথি ধ'রে, সময় কোথা পাবি বল্ ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই॥
পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও নিয়ে যাও সাথে করে--
কেহ নাহি আসে, একা চলে যাও মহত্ত্বের পথ ধরে।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন, ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন--
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন, মিছে নয়নের জল ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই॥...

না না সা -া । -া । -া নধা না । নর্রা -সর্রর্সা নধনা । -পা নধা না ।
আ গে চ ০ ল্ ০ আ০ গে চ০ ০০ল্ ভা০০ ই আ০ গে

॥

। র্সর্রর্সা -া -া । -া -া -া । পপধা -ণা ণধা । পধপাঃ মঃ গো ।
চ০০ ০ ০ ০ ০ ল্ পড়ে০ ০ থা০ কা০০ পি ছে

। গগমা -পা মপমা । গা রঃ সা । গা মা গমা । পা পনা নধনা ।
মরে০ ০ থা০০ কা ডম ছে বেঁ চে ম০ রে কি০ বা০০

। ণর্সা -া নধনা । -পা নধনা না ॥
ফ ল্ ভা০০ ই আ০০ গে

॥ পপা -া পা । না নাঃ -র্সঃ । র্সর্সা -নর্সরা না । র্সর্সা -া -া ।

প্রতি ০ নি মে ষে ই যেতে ০০০ ছে সম ০ য়্

। র্সর্সা -া র্সা । -া র্রর্সর্রা র্সা । ননাঃ -ধঃ পা । নঃধনর্সঃ না -া ।

দি ন্ ক্ষ ণ্ চে০০ ছে থাকা ০ কি ছু০০০ ন য়্

। পপা -া পা । পাঃ পাঃ পা । পনা -া আ । ধর্সা না না ।

সম য় স ময় ক রে পাঁজি ০ পূঁ থি ধ রে

। গগা -মা পা । পা ইা না । নর্রর্সা -া নধনা । -পা নধা না ॥

সম য়্ কো খা পা০ বি ব০০ ল ভা০০ ই ই গে

॥ সমা -া সপা । পা পা পা । পপা পা । পা পা -ধা ।

পিছা ০ য়ে০ যে আ ছে তারে তে কে না ও

। ণা ধণার্স ণর্সণা । -া ধা পধপা । মা -া -গমপা । গা -া -া ॥

নি য়ে০০ যাও ০ সা থে০০ ক ০ ০০০০ রে ০ ০

। র্সর্সা -া গা । র্রা র্রমা গা । র্সরা -র্গাঃ রে । র্সা র্সা -া ॥
কেহ ০ না হি আ০ সে একা ০ চ লে যা ও

। গা গমা পা । না নধা রে । র্সর্রর্সনা -র্সাঃ -নঃ । ধনা -ধঃ পা ॥
ম হৎ ত্বে র প থ ধ০০০ ০ ০ রে ০ ০

। পা পা পা । না না নর্সা । র্সা নর্সর্রা র্সা । র্সনা র্সা -া ॥
পি ছু হ তে ডা কে মা রা০০ ও কাঁ দ ন্

। র্সসা -া র্সা । র্সা নর্সর্রা র্সা । ননাঃ অঃ পা । নঃধনর্স না -া ।
ছিঁড়ে ০ চ লে যা০০ ও মোহে ০ র বাঁ০০০ ধ ন

। র্সর্গা -া র্রা । র্গা -র্গর্সর্রা র্মর্গা । র্সর্রাঃ । -র্গঃ র্রা । র্সর্সা -া -া ।
সাধি ০ তে হ ই০০০ বে০ প্রাণে ০ ০ সাধ ০ ন

। গা মা পা । পনা নধা না । নর্সর্রা -র্সা নধনা । -পা নধনা না ।
মি ছে ন য়০ নে০ র জ০০ ল্ ভা০০ ই “আ০০ গে”

আগে চল আগে চল ভাই গানটির সপ্তচত্বারিংশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। গানের শিরোদেশে রাগ ও তালের কোনো নির্দেশ নেই। তবে গানটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে গানটি বেহাগ রাগে সুরারোপিত এবং দাদরা তালে নিবদ্ধ। গানটির সুর বিশ্লেষণ করার পূর্বে বেহাগ রাগ সম্পর্কে জানা জরুরী–

বেহাগ রাগ উত্তর ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে বর্ণিত বিশেষ এক ধরনের রাগ। যা বিলাবল আবার অনেকে মনে করেন কল্যাণ ঠাঁট থেকে উৎপন্ন ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ। এ রাগের স্বর পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে আরোহণে ঋষভ ও ধৈবত বর্জিত হলেও অবরোহণে সকল স্বরই ব্যবহৃত হয়। আগে উক্ত রাগে মাঝে মাঝে বিবাদী স্বর হিসাবে কড়িমধ্যম এর উপস্থিতি থাকলেও বর্তমানে কড়িমধ্যমের উপস্থিতি নিয়মিতভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

এই রাগটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

আরোহণ: ˙নস গ ম প ন র্স।

অবরোহণ : র্সন ধপ ক্ষপ গমগ রস।

পকড় : ন্স, গমপ, গমগ, গা রস।

ঔড়ব- সম্পূর্ণ জাতির এ রাগের আরোহণে ঋষভ ধৈবত বর্জিত। সাধারণত রাত্রীর দ্বিতীয় প্রহরে মতান্তরে রাত্রীর তৃতীয় প্রহরে এ রাগ পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এর বাদী স্বর গান্ধার এবং সমবাদী স্বর নিষাদ। বিলাবল ঠাঁটের জন্য রাগ বেহাগে বর্তমানে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহারের পাশাপাশি কড়ি মধ্যমের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রাচীনকালে এ রাগে কড়িমধ্যমের ব্যবহার আবশ্যকীয় ছিল না। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁর হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি গ্রন্থে এ রাগের বিবাদী স্বর হিসেবে কড়িমধ্যমের ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন।

আরোহণ- নি্ সা গা মা পা নি র্সা

অবরোহণ- র্সা নি ধা পা ক্ষা গা মা গা রে সা

আমাদের বিশ্লেষিত গানটির স্বরলিপি পর্যালোচনা করে প্রতিয়মান হয় যে, এটিতে বেহাগের প্রাচীন রাগরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।

গান

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।

কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া,

বলো 'উঠ উঠ' সঘনে গভীরনিদ্রামগনে ॥

হেরো তিমিররজনী যায় ওই, হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী--

নব আনন্দে, নব জীবনে,

ফুল- কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে ॥

হেরো আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল-পথে,

কিরণকিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণরথে--

চলো যাই কাজে মানবসমাজে, চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে--

থেকো না অলস শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে ॥

যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস কুহক মোহ যায়।

ওই দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপনপ্রায়।

ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ, আরম্ভ করো জীবনের কাজ--

সরল সবল আনন্দমনে, অমল অটল জীবনে ॥

॥

॥ গা মা ধপা -া । গা মা ⁿধা -া । ধনঃধঃ -ননা র্সাঃ -নঃ ।

আ নন্ দধ্ব ০ নি জা গা ও গ০০ ০গ নে ০

॥ ধা না -া । র্সা -া । ধা -না । পা -ধা -া । মা -া । -পা -মা ।

কে আ ০ ছ ০ জা ০ গি ০ ০ য়া ০ ০ ০

॥ গা -মাঃ -গঃ । ও়া -া । গা -া । ধা -পা -া । রে -া । গা -া ।

পু ০ ০ র্ ০ বে ০ চা ০ ০ হি ০ য়া ০

॥ পা পা -া । ধা -া । না -ধা । পা -ধা -া । র্সা -া । -া -না ।

ব লো ০ উ ০ ঠ ০ উ ০ ০ ঠ ০ ০ ০

। ধা -না -া । র্রা -া । র্সা -া । গা গা -া । গা -া । গা -মগা ।

স ০ ০ ঘ ০ নে ০ গ ভী ০ ও ০ নি ০০

। রগরা -সা -া । ন্া -া । ন্সা -রা । সা -া -া । ধা -া । না -া ॥

দ্রা০০ ০ ০ ম ০ গ০ ০ নে ০ ০ জা ০ গা ও

-া -া -া পপা ॥ পা পা -া ধা -া । -ধা -া ।

০ ০ ০ হেরো ০ তি মি ০ র ০ র ০

। ইা না -া । র্সা -া । নর্সা -র্রা । র্সা -া -া । -া -া । -া -না ॥

জ নী ০ যা ০ ০০ য়্ ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ই

। ধা না -া । র্সা -া । ন্র্সা -া । ধা পা -া । মা -া । গমা -পা ॥

হা সে ০ উ ০ ষা ০ ন ব ০ জ্যো ০ তি০ র্

। মা -া -া । -া -া । -া -া । র্গা র্গা র্গা । র্গা -া । র্গা -র্মা ॥

ময়ী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন ব আ ন ন্ দে ০

। র্রা র্সা -া । না -া । নর্সা -র্রা । র্সা -া -া । -া -া । -া -া ।

ন ব ০ জী ০ ব০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০

। গা -া গা । গা গা । গা -মগা । রা গা রা । সা রা । সা -া ।

ফু ল্ ল কু সু মে ০০ ম ধু র প ব নে ০

। সা রা গা । মা পা । ধা -া । -না -া না । র্সা -া । -া -া ॥

বি হ্ গ ক ল কু ০ ০ ০ জ নে ০ ০ ০

-া -া -া সসা ॥ সা মা । মা -া । মা -া । গমা -পা -মা পা -া । -া -া ।

০ ০ ০ হেরো আ শা র্ ০ আ ০ লো০ পা ০ কে ০ ০ ০

। গা গা -া । মা -া । গমা -পা । গা -মা রা । সা -া । -া -া ।

জা গে ০ শু ০ ক০ ০ তা ০ ০ রা ০ ০ ০

। পা পা -র্সা । না -া । ধপা -া । গা মা -া । না -া । ধা -া ।

উ দ ০ য় ০ অ ০ চ ল ০ প ০ খে ০

। ধা না ধা । না না । র্সা -নঃ । ধা না ধা । না -া । র্সা -া ।

কি র ণ কি রী টে ০ ত রু ণ ত ০ প ন্

। পা ধা পা । মা গা । মা -গ । রা -পা -মা । গা -া । -া -া ।

উ ঠি ছে অ রু ণ ০ র ০ ০ থে ০ ০ ০

। পা পা -া । ধা -া । -া -া । না -া -া । র্সা -া । -া -না ।

চ লো ০ যা ০ ০ ই কা ০ ০ জে ০ ০ ০

। ধা না -া । র্সা -া । নর্সা -রা । না -র্সা -ধা । পা -া । -া -া ।

মা ন ০ ব ০ স০ ০ মা ০ ০ জে ০ ০ ০

। র্গা র্গা -া । র্গা -া । র্গা -র্মা । র্রা -া -া । র্সা -া । -া -া ।

চ লো ০ বা ০ হি ০ রি ০ ০ রা ০ ০ ০

। মা মা -া । মা -া । মা -া । গমা -পা -মা । পা -া । -া -া ।

জ গ ০ তে ০ র ০ মা ০ ০ ঝে ০ ০ ০

। সা সা সা । রা রা । রা -া । গা -া মা । পা -া । -া -া ।

থে কো না অ ল স ০ শ ০ য় নে ০ ০ ০

। গা মা ধপা -া । গা মা [ন]ধা -া ।

আ নন্ দধ্ব ০ নি জা গা ও

। পা পা পা । ধা ধা । ধা -া । না -ধা না । র্সা -া । -া -া ॥

থে কো না ম গ ন ০ স্ব ০ প নে ০ ০ ০

২২

আমাদের বিশ্লেষিত গানটি হাম্বির রাগে এবং তাল ফেরতায় সুরারোপিত। স্বরবিতানের ষট্‌চত্বারিংশ খণ্ডে এ গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়ছে। স্বরলিপির শিরোভাগে তালের নাম উল্লেখ নেই। স্বরলিপিটি পর্যালোচনা

করলে দেখা যায় গানটির প্রথম পংক্তি আনন্দধনি জাগাও গগনে ৪ ।৪ ।৪ ছন্দের ১২ মাত্রার তালে এবং বাকি অংশ তেওড়া ও দাদরা তালে নিবদ্ধ।

অপরদিকে সুধীর চন্দের রবীন্দ্রসংগীত রাগ-সুর নির্দেশিকা গ্রন্থে এ গানের তাল নির্দেশ আছে কাহারবা-তেওড়া-দাদরা। উল্লেখ করা জরুরী যে শান্তিনিকেতনের পরম্পরা অনুযায়ী উক্ত গানটি চৌতাল- তেওড়া-দাদরা তালে গীত হয়।

হাম্বির রাগের চলন

আরোহণঃ স র গ ম নধ, ন র্স।

স র গ ম প, গ ম নধ, ন র্স।

অবরোহণঃ র্স ন ধ প, ক্ষ প, গ ম র স।

হাম্বির রাগে আধারিত এ গানের প্রথম পংক্তির স্বরবিন্যাস

গামাধাপা, গামাধা, ধানিধা, নির্সানি

স্থায়ীর পরবর্তী দুই পংক্তি "কে আছো জাগিয়া. . . গভীর নিদ্রা মগনে" এর স্বরবিন্যাসে ধানির্সা ধানিপাধা মাপা গামা গারে গা, ধাপা রেগা পাধা নিধা পাধা সানি, ধানি র্রে র্সা, গা মাগা রেগারেসা নি্ সা রে সা ধ্নি্।

দেখা যাচ্ছে গানের স্থায়ী অংশে বক্রগতির হাম্বির রাগের রূপটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

অপরদিকে অন্তরার স্বরবিন্যাসে দেখা যায়, পাধানির্সা, নির্সার্রেনি, ধানির্সা, ধাপামা, গামাপামা, র্গার্মার্রের্সানি সারেসা, গামাগারেগারে সারেসা, সারেগামাপাধানির্সা। অর্থাৎ হাম্বির আরোহণ বক্রগাতির হলেও অন্তরার শেষে বিহগকলকুজনে এর স্বরবিন্যাসে সরল গতির আরোহন প্রযুক্ত হয়েছে। যা রাগরূপকে ব্যহত করলেও শিল্পসৌন্দর্য্যের উৎকর্ষতার প্রমাণ দেয়।

বিশ্লেষিত গানটির ২য় অন্তরার শুরুতে সা-মা স্বরবিন্যাস কল্যাণ ঠাঁটের আশ্রিত কেদার রাগের আভাস দেয়। এছাড়া গানের বাকি অংশে হাম্বির রাগের বেশ কিছু স্বরবিন্যাস যেমন গৃহীত হয়েছে তেমনি রাগ বর্হিভূত কিছু স্বরবিন্যাসও লক্ষ্য করা যায়। যেমন– "গামাপা গামারেসা, গামাধানির্সা, পাপাসা- প্রভৃতি।

বর্তমান প্রচলিত হাম্বির রাগের কড়িমধ্যমের প্রাধান্য দেখা গেলেও এ গানের শুধুমাত্র তৃতীয় অন্তরার অংশে ‘রেগারে গামাপা ‘ক্ষ’ ধাপা মাগারেগামাপামা’ স্বরবিন্যাসের কড়িমধ্যমের ব্যবহার লক্ষণীয়।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালে হাম্বির রাগকে শুদ্ধ মেলের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এ প্রসংঙ্গে বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে বলেন ‘সংস্কৃত গ্রন্থাকারগণ হাম্বির, কেদার কামোদ ছায়ানট এই সব রাগকে বিলাবল ঠাঁটের অন্তগত বলে মনে করেন।[২৩]

বিশ্লেষিত এই গানটিতে সেই প্রাচীন হাম্বির রাগের রূপটিই মূর্ত হয়েছে।

গান

আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?

আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?
    উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে ॥
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়, আপনাকে তুই করে নে জয়--
    সবাই তখন সাড়া দেবে ডাক দিবি তুই যারে ॥
বাহির যদি হলি পথে ফিরিস নে আর কোনোমতে,
    থেকে থেকে পিছন-পানে চাস নে বারে বারে।
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে, ভয় শুধু তোর নিজের মনে--
    অভয়চরণ শরণ ক'রে বাহির হয়ে যা রে ॥

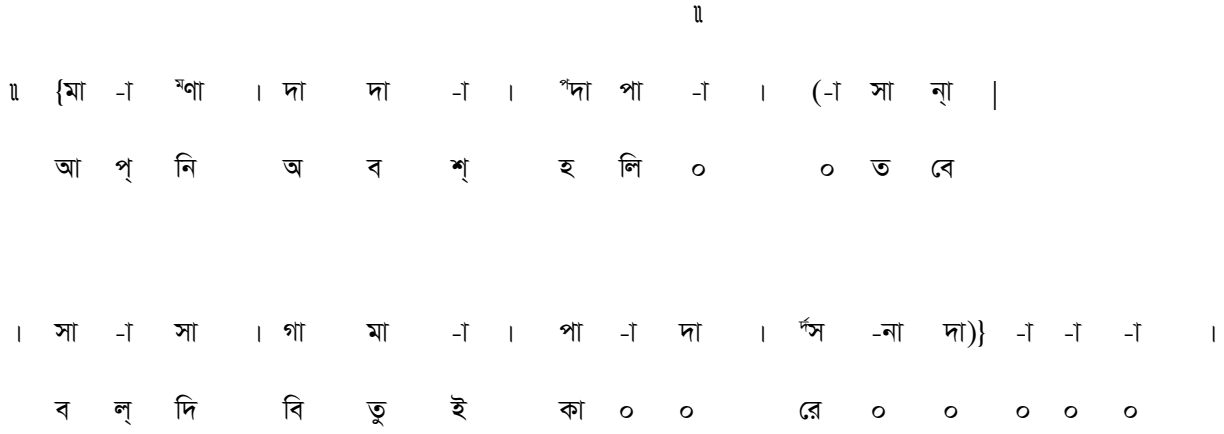

। পা দা -া । না র্সা -া । পা দা -া । নি -া -া ।

উ ঠে ০ দাঁ ড়া ০ উ ঠে ০ দাঁ ০ ০ ০

। র্সা -া -া । ঠ -া -া । না না -র্ঝা । র্সা র্সা -র্ঝর্সা ।

ড়া ০ ০ ০ ০ ০ ভে ঙে ০ প ড়ি গ ০

। না র্সা না । দা -পা -মগা ॥

না ০ ০ রে ০ ০০

। -া -া -া ॥ {পদা দা -া । না র্সা -া । র্ঝা র্ঝা -া র্ঝ -া -না ।

০ ০ ০ ক রি স্ নে লা জ্ ক রি স্ নে ০ ০

। র্সা -া -া । -া -া -া । না -া র্ঝা । র্সা -র্সা -া ।

ভ ০ ০ ০ ০ য়্ আ প্ না কে তু ই

। না র্সা -না । দা পা -মা} । গা মা -া । গা মা -া ।

ক রে ০ নে জ য়্ স বা ই ত খ ন্

। পা দা -া । না র্সা -া । না -া র্ঝা । র্সা -র্সা -র্ঝর্সা ।

সা ড়া ০ দে বে ০ ডা ক দি বি তু ০ই

। ন -র্সা -না । দা পা -মগা ॥

যা ০ ০ রে ০ ০০

। -া -া -া ॥ সা সা -া -গা মা -া । পা পা -া পা পা -া ।

০ ০ ০ বা হি র্ য দি ০ হ লি ০ প থে ০

। পা দা -া । দা দা -ণদা । পা পা -ণা । দা দা -ণদা ।

ফি রি স্ নে আ র্ কো নো ০ ম তে ০০

। পা ঠ -া । -া -া -া । পা দা -া । না র্সা -া ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ থে কে ০ থে কে ০০

। না র্সা না । দা পা -মগা । মা -া -ণা । দা দা -পা ।

পি ছ ন্ পা নে ০০ চা স্ নে বা রে ০

। মা -গা -পা । মা -পমা -গা ।

বা ০ ০ রে ০০ ০

২৪

আলোচিত গানটি স্বরবিতানের ষট্‌চত্বারিংশ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে গানটির কোনো সুর-তাল নির্দেশ নেই। তবে গানটির সুরবিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয় প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত রামকেলি রাগে গানটিতে সুরারোপ করা হয়েছে। আর তাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গানটি দাদরা তালে বাঁধা । বলে রাখা জরুরী উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতি অনুযায়ী রামকেলি ভৈরব ঠাঁটের অন্তর্গত একটি সম্পূর্ণ জাতীয়

রাগ। এ রাগের বাদী স্বর পঞ্চম এবং সমবাদী স্বর ঋষভ। এ রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির মধ্যে 'রে ধা' কোমল এবং উভয় মধ্যম ও নিষাদের ব্যবহার হয়ে থাকে।

পা, দা নি দা পা গা মা ঋ সা- এ রাগের প্রাণ স্বরবিন্যাস

আরোহ- সা ঋা গা মা পা দা নি সা

অবরোহ- সা নি দা পা মা পা দা নি দা পা গা মা ঋ সা।

বলাবাহুল্য বিষ্ণুপুর ঘরানায় এবং বাংলা কীর্তনে প্রচলিত রামকেলি রাগের আরোহণে ঋষভ বর্জিত ও কড়িমধ্যমের ব্যবহার হয় না। অন্য প্রকার রামকেলিতে মা-নি সংগতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

আমাদের গবেষণার বর্তমান বিশ্লেষিত গানটি বাংলা রামকেলি অর্থাৎ তীব্র মধ্যম বর্জিত রামকেলির ব্যবহার দেখা যায়। আর গানটির শুরুতে মা-নি স্বরসংগতি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

গান

আমি ভয় করব না ভয় করব না

আমি ভয় করব না ভয় করব না
    দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না॥
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে
সহজ পথে চলব ভবে পড়ব না, পাঁকের পরে পড়ব না॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না॥

॥

গা	।	ধা	পা	-া	॥	গমা	-া	গা	।	রা	সা	-া	।	গা	-া	রা	।	সরা	-গা	-া	।
আ		মি	ভ	য়্		ক	র্	ব		না	ভ	য়্		ক	র্	ব	০	না০	০		

।	-া	-া	গা	।	ধা	পা	-া	।	গমা	-া	গা	।	ওা	সা	-া	॥
	০	০	আ		মি	ভ	য়্		ক	র্	র্		না	ভ	য়্	

।	সা	-া	রা	।	সরা	-গা	-া	।	-া	-া	গা	।	পা	পা	-া	॥
	ক	র্	ব		না০	০	০		০	০	দু		বে	লা	০	

।	পা	পা	-া	।	পা	পা	-া	।	ক্ষ	-া	পা	।	ধা	পা	-া	।
	ম	রা	র্		আ	গে	০		ম	র্			না	ভা	ই	

। ক্ষ -া পা । ক্ষপা -ধা -া । -া -া পা । পা গা -া ॥

ম র্ বো না০ ০ ০ ০ ০ “আ মি ভ য়”

॥ {গা গা -া । পা পা -ধা । র্সা -া র্সা । র্সা র্সা -র্রা ॥

ত রী ০ খা না ০ বা ই তে গে লে ০

। র্সা র্সর্রা -র্গা । র্গা র্রা -া । র্সা না -া । ধা পা -া ।

মা ঝে০ ০ মা ঝে ০ তু ফা ন্ মে লে ০

। র্গা -া র্গা । র্রা র্রা -া । র্সা না -া । ধা পা -া ।

তা ই ব লে হা ল্ ছে ড়ে ০ দি য়ে ০

। সা -া রা । গা -া -া । গা -া ধা । ধা পা -া ।

ধ র্ ব না ০ ০ কা ন্ না না কা টি

। সা -া রা । সরা -গা -া । -া -া গা । পা পা -া ।

ধ র্ ব না০ ০ ০ ০ ০ দু বে লা ০

। পা পা -া । পা পা -া । ক্ষা -া পা । ধা পা -া ।

ম রা ব্ আ গে ০ ম র্ ব না ভা ই

। ক্ষা -া পা । ক্ষপা -ধা -া । -া -া পা । পা গা -া ॥

ম র্ ব না০ ০ ০ ০ ০ “আ মি ভ য়্”

॥ {গা -া গা । পা পা -ধা । -র্সা -া র্সা । র্সা র্সা -র্রা ।

শ ক্ ত যা তা ই সা ধ্ তে হ বে ০

॥ র্সা র্সর্রা -র্গা । র্গা র্রা -া । -র্সা -না না । ধা পা -া} ।

মা থা০ ০ তু লে ০ র ই ব ভ বে ০

॥ র্গা র্গা -া । র্রা র্রা -া । -র্সা -না না । ধা পা -া ।

স হ জ প থে ০ র ই ব ভ বে ০

॥ সা -া রা । গা -া -া । গা ধা -ধা । ধা পা -া ।

প ড়ু ব না ০ ০ পাঁ কে ব্ প রে ০

॥ সা -া রা । সরা -গা -া ।

প ড়ু ব না০ ০ ০

২৫

আমি ভয় করবো না ভয় করবো না গানটি বাউল অঙ্গের মিশ্র বিভাস রাগে বাঁধা। বিভাস রাগ মূলত ৩ প্রকার হয়ে থাকে। যেমন –

১. ভৈরবী ঠাঁটের বিভাস

২. মারুয়া ঠাঁটের বিভাস

৩. বিলাবল ঠাঁটের বিভাস- এই রাগ সাধারনত বাংলা কীর্তন ও বিষ্ণুপুর ঘরানায় আছে।

গানের প্রথম পংক্তিতে "আমি ভয় করবো না ভয় করবো না" এখানে গা ধা পা মা গা রে সা, সা রে সা রে গা স্বর বিন্যাসে গঠিত। যদিও বিলাবল রাগে শুদ্ধ মধ্যম বর্জিত। তবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষিত এ গানের প্রথম পংক্তির প্রায় গোড়ার দিকে এ স্বর (মধ্যম) প্রয়োগ করেছেন। এতে শাস্ত্রীয় রাগের শাস্ত্রের বিঘ্ন ঘটলেও রাবীন্দ্রিক সুরের যে শৈলী সৃষ্টি হয়েছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে শিল্পের উৎকর্ষতার বিচারে স্বার্থক শিল্পের উদাহরণ হিসেবেই বিবেচ্য হবে।

আবার গানটির দ্বিতীয় পংক্তির স্বরবিন্যাসে রাগ বহির্ভুত কড়িমধ্যমের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এখানে : গা পা ক্ষা পা ধাপা ক্ষা পা ধা স্বরবিন্যাস উক্ত গানে রবীন্দ্রনাথ তিনটি অন্তরাতেই ব্যবহার করেছেন। তিনটি অন্তরার সুর একই । যা বিশ্লেষণ করলে বিভাস রাগ মূর্ত হয়ে ওঠে।

অন্তরার স্বরবিন্যাস ; গা পা ধা র্সা র্রে, র্সা র্রে র্গা র্রে র্সা নি ধা পা।

র্গা র্রে র্সা নি ধা পা, সা রে গা, গা ধা পা, সা, রে, গা।

বাউল গান

বাউল এক প্রকার লৌকিক অধ্যাত্মসাধনা সংগীত। যা ঐতিহ্যবাহী বাংলা লোকসংগীতের ধারায় প্রধানতম শৈলীর মধ্যে অন্যতম। 'বাংলায় 'বাউল' শব্দটি নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কারো মতে, সংস্কৃত 'বাতুল' থেকে বাউল শব্দটি বাংলায় এসেছে। সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল। বস্তুত বাউল ভাবের পাগল, রসের সাধক। এই অর্থে 'বাউরা' (অর্থ পাগল) কথাটির সঙ্গে ধ্বনি ও ভাবের সাদৃশ্য রয়েছে। এই 'বাউরা' শব্দটিও বাউল বা বাতুলের অপভ্রংশ। বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণির মুসলমান সাধকদের (সুফী ধর্ম প্রভাবিত) 'আউল' বা আউলিয়া বলে অভিহিত করা হয়।[২৬] অপর এক রেয়াতে বাউল শব্দের অর্থ পাগল, উন্মাদ, ভাবোন্মাদ, প্রেমোন্মাদ প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে একথা সত্য যে বাউলরা লোভ-লালসায় আচ্ছন্ন থাকে না। এরা ঈশ্বরের নৈকটের নিমিত্তে সবসময় ব্যাকুল থাকেন। অধ্যাত্ম-সাধনাকে জীবন ও জগতের মুক্তির একমাত্র উপায়স্থল বলে ভেবেছে অনেক মানুষ। বাউলদের নিকট মানবদেহ বিশ্ববক্ষাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতীক। এরা জীবন জগতের সাধারণ ও প্রচলিত সব ধারাকে পরিহার করে নিজস্ব মতাদর্শের দ্বারা পরম সত্যকে অনুসন্ধান করে। এতে নানা রকম মত ও পথের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

বাউল সাধনার উদ্ভব হিসেবে সর্বজন গৃহীত মতবাদ ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীর। তিনি বলেছেন 'উনিশ শতকের আগে বাউল সংগীতের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে তার আগেও যে বাউল মত ও বাউল গানের প্রচলন ছিলো এমন অনুমান করা গেলেও কোনো লেখ্যরূপ মেলে না।'[২৭] অপরদিকে অনেক গবেষকদের মতে সতেরো শতকের মধ্যভাগ থেকে বাউল মতের উদ্ভব। বাউল ধর্মের উৎপত্তিকাল হিসেবে ক্রমপরিণতির ধারায় তিনি একটি খসড়া চিত্র উপস্থাপন করেছেন। যা নিম্নরূপ

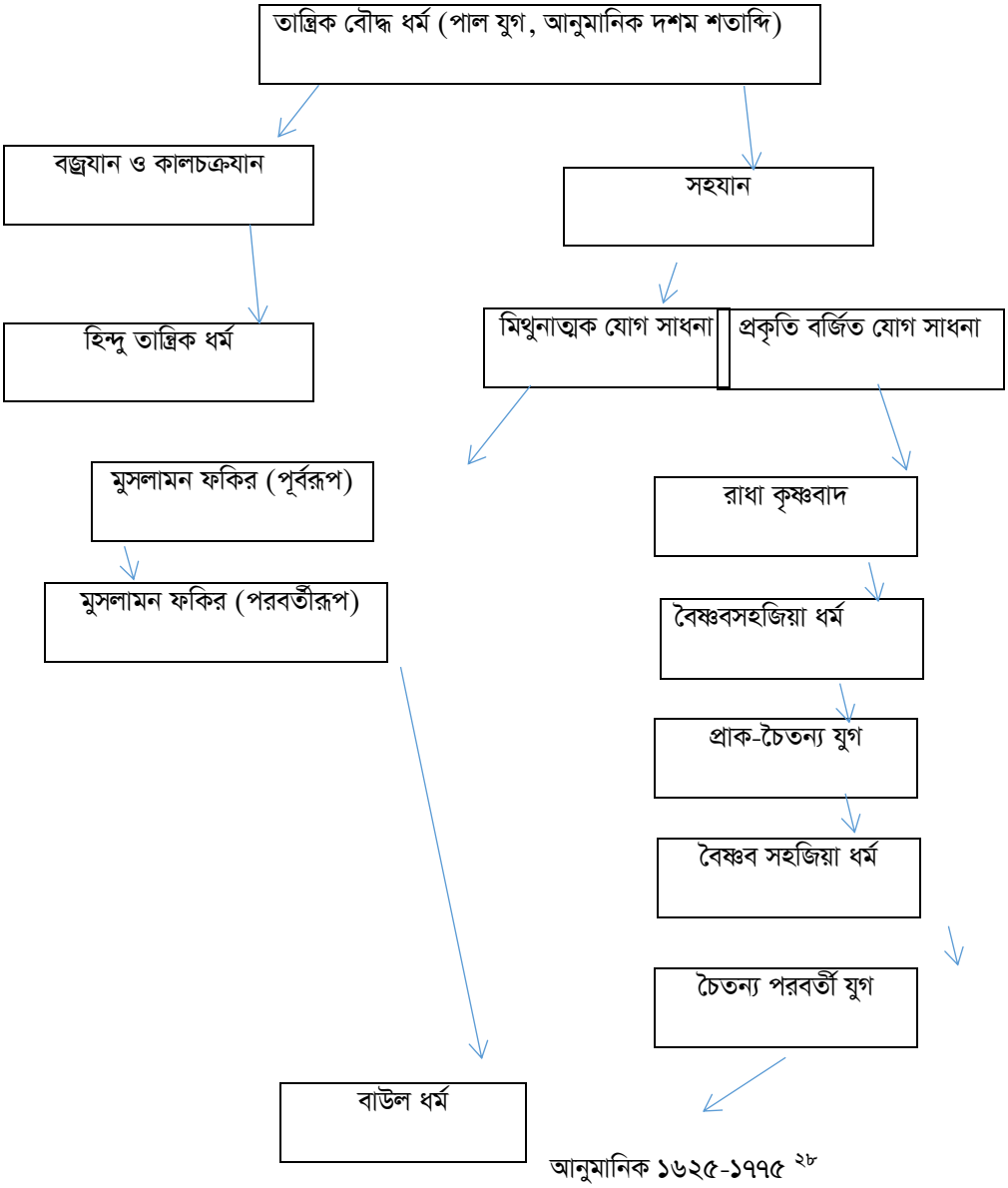

বাউল গানে রাগ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এখানে রাগ অর্থে অভিমান এবং প্রেমের নিবিড়তা বোঝানো হয়েছে। সাধারণত সাধনপন্থাকে বাউলরা রাগের কারণ হিসেবে অভিহিত করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়–

"আমার হয় না রে সে মনের মত মন
আগে জানব কি সে রাগের কারণ।"

বলাবাহুল্য বাউল মতবাদ নিতান্তই গুরুবাদের মতবাদ। শুধু বাউল সম্প্রদায় গুরুদের সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে থাকে। এটি বাঙালি ভাবদর্শনের সর্বাপেক্ষা গভীরতম দর্শন। আর বাউল সাধকরা গুরুদের সাধারণত দুই রূপে দেখেন- তাদের মধ্যে প্রথম হলো মানবগুরু রূপে অপরটি পরমাত্মা বা পরমপ্রিয় হিসেবে। বলাবাহুল্য উপমহাদেশীয় বাউল সাধকরা মূলত হিন্দু মুসলিম দুই ধর্মালম্বীর হয়ে থাকে। এদের মধ্যে হিন্দু বাউলরা শ্রী চৈতন্যকে গুরুশ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করেন আর সুফী বাউলরা করেন হজরত আলী (রাঃ) কে।

বাউল গানের বৈশিষ্ট্য

১. বাউল গান একটি বিশেষ অঞ্চলে রচিত হলেও সংগীত শিল্পীদের কারণে সুর ও গায়কীতে আসে পরিবর্তন। কখনও কখনও শব্দেরও পরিবর্তন ঘটে।

২. বাউল গান সাধারণত দুটি ধারায় পরিবেশিত হয়–

ক. আখড়া আশ্রিত সাধন-সংগীত। এই গানের ঢং ও সুর শান্ত এবং মৃদু তালের। এতে অনেকটা হামদ্-নাত ও গজলের সাদৃশ্য দেখা যায়।

খ. আখড়া বহির্ভূত অনুষ্ঠানভিত্তিক আখড়া বহির্ভূত অনুষ্ঠানভিত্তিক চর্চা হয় সাধারণত জনসম্মুখে। এ জন্য এই গান চড়া সুরে গীত হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে একতারা, ডুগডুগি, খমক, ঢোলক, সারিন্দা, দোতারা, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়।

৩. আখড়া আশ্রিত বাউল গানে নাচের প্রচলন নেই।

৪. তবে আখড়া বহির্ভূত বাউল গানে নাচের প্রচলন আছে।

৫. বাউল গানে অনেক সময় কৃত্তাসৃত পরিবেশনা হয়ে উঠে কেননা কখনো গ্রাম এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে বাউল গানের মাধ্যমে তা নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করা হয়। তখন শিল্পীরা নেচে নেচে গান করে।

৬. বাউল গানে কেউ কেউ শাস্ত্রীয় রাগ সংগীতের প্রভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু এ গান মূলত ধর্মীয় লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত।

৭. কিছু কিছু বাউল গান কীর্তন আশ্রিত। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে এমনটি হয়েছে।

৮. অনেক বাউল গানে সুফিভাবনা প্রবল।

৯. তবে অঞ্চলভেদে সুরের পার্থক্য রয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাউল গানে সুরের পার্থক্য রয়েছে।

১০. বাউল গানের তাল বিশ্লেষণ করলে দাদরা, কাহারবা, কখনও ঝুমুর, একতালা কিংবা ঝাঁপতাল লক্ষ্য করা যায়।

১১. বাউলরা যখন এককভাবে সংগীত পরিবেশন করে তখন নিজেই ২টা বাদ্যযন্ত্র বাজায়। আবার যখন দলবদ্ধভাবে সংগীত পরিবেশন করে তখন সাথে আলাদা বায়েন দল থাকে এবং অনেক সময় তাদের সাথে দোহারও থাকে।

১২. বাউল গান পরিবেশনের সময় আধুনিক শিল্পীদের কণ্ঠে কখনও কখনও রাগের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে একথা সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়।

১৩. এ গানে একজন মূল গায়ক থাকে। তার সঙ্গে অন্যরা ধুয়া ধরে।

১৪. বাউল গানে সাধারণত দু'ধরনের সুর লক্ষ্য করা যায়

ক. কলি অর্থাৎ অস্থায়ীতে এক সুর।

খ. অন্তরাতে আলাদা সুর। তবে প্রতিটি অন্তরার সুর প্রায় সময় একই হয়ে থাকে।

১৫. বাউল গানের গতি পরিবর্তনশীল। ধীর লয় বা মধ্য লয় থেকে শুরু হলেও সবশেষে গতি এক জায়গায় থাকে না।

১৬. এ গানে অস্থায়ী এবং অন্তরা প্রধান। অস্থায়ীকে কখনও ধুয়া, মুখ বা মহড়া বলা হয়। দ্রুত লয়ের এ গানে প্রতি অন্তরার পর অস্থায়ী গাইতে হয়।

১৭. কোনো কোনো বাউল গানে সঞ্চারী থাকে।

১৮. পশ্চিমবঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব সুরের আধিক্য, আর বাংলাদেশে সুফি গজলের সুরের আধিক্য।

১৯. উদাসী ভাব বাউল গানের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এর সুরে গভীরভাবে মিশে থাকে একজন সাধকের না পাওয়ার এক বেদনা।

২০. গ্রামীন পাঁচালী গানের প্রভাবে অনেক সময় অনেক বাউল গানের সাথে বিশেষ ধরনের নাচও করে থাকে।

গান

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥...

মা পা ॥ {গা গমা -গা । রা -সা -রসা । ণ্‌স্‌ণ্া -ধা -া । -া ধ্া ণ্া ।
আ মার্‌ সো না০ র্‌ বা ০ ০ঙ লা০০ ০ ০ ০ আ মি

। গা সরা -গা । রা সা -রসা । -ণ্া সা -া । -রা গা ।
তো মা০ র্‌ ভা লো ০০ বা সি ০ ০ ০

। -রা -সা -া । (-া মা পা)} । -া -া -া । -া -া সা । {সা সা -া ।

০ ০ ০ ০ আ মার্ ০ ০ ০ ০ ০ চি র দি ন

। ওা মা -া । পা পা (-া । -া -া সা)} । -া । পা পা -ধা । পা পা -া ।

তো০ মা র্ আ কা ০ ০ শ্ চি শ্ তো মা র্ বা তা স্

। পা পধা -ণা । ধা পা -া । -া -া -া । র্সা র্সা ।

আ মা০ র্ প্রা ণে ০ ০ ০ ০ ও গো

। ঁসা ণা -া । ধাধা পা -ধপা । ঁপা গা -া । গা গমা -পা। ॥

আ মা র্ প্রা ণে ০০ বা জা য় বাঁ শি০ ০

-া পা পা ॥ { মা ধা -া । ধা ধা না । র্সা নর্সা -র্গা । র্রা র্সা -া ।

ও মা ফা গু ০ নে তো র্ আ মে র্ ব নে ০

। না ঁর্সা -ধা । -া ধা না । না না র্সা -া । (-া -র্রা -র্গা ।

ঘ্রা ণে ০ ০ পা গল্ ক রে ০ ০ ০ ০ ০

। -র্রা -সা -া । -া না ধা । ঁনা -া -া । -া -া –র্সা ।

০ ০ ০ ০ ম রি হা ০ ০ ০ ০ য়্

। র্সা -া র্সা । না ধপা -া)} । -া না না । না -া র্সা । র্সা র্সা র্সা র্রা ।

হা য়্ রে ও মা ০ ০ ও মা অ ০ ঘ্র নে তো র স্

। র্সা ণর্সা -ণধা । পা -পা ধা । ণা -া র্সা । র্সা র্সা -র্রা

ভ রা০ ০০ ০ ক্ষে তে অ ০ ঘ্রা নে তো র্

। ণর্সা ণা -ধা । পা মগা -মা । মণা -া ণা । পধা পা -া

ভ রা ০ ক্ষে তে০ ০ কী ০ দে খে ছি ০

। -া -া -া । -া র্সা র্সা । পর্সা -া ণা । ধা পা -ধপা

০ ০ ০ ০ আ মি কী ০ দে খে ছি ০০

। মপা গা -া । গা পমা -পা

ম ধু র্ হা সি০ ০

২৯

গান

আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে

আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে;
কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।।
লাগি সেই হৃদয় শশী, সদা প্রাণ হয় উদাসী,
পেলে মন হতো খুশি, দিবা-নিশি দেখিতাম নয়ন ভরে।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে, নিভাই কেমন করে-
মরি হায়, হায় রে-
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
(ও রে) দেখনা তোরা হৃদয় চিরে
কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।।

মা মা ॥ গা গা মগা । রা সা রসা । ণধা -া ণধা । -া ধা ণা ।
আ মি কো থা য়০ পা ব ০০ তা ০ রে ০ আ মার

। সা সরা -গা । রা গা -রসা । -ণা সা -া । -রা গা ।
ম নে০ র মা নু ০ষ যে রে ০ ০ ০

॥
। রগরা সা -া । -া -া -া । -া -া সা । সা সা -া ।
০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ হা রা য়ে ০

। রা পমা মা । মা গা -া । ঈা -া ধা । পা মা -া ।
সে ই মা নু ষে ০ তা র উ দে শে ০

। পা -া ণা । ধা পা -া । -া -া -া । -া র্সা র্সর্রা ।

দে ক বি দে শে ০ ০ ০ ০ ০ আ মি০

। র্সা -া ণা । ধা পা ধপা । মা পা -া । গা গমা গা ॥

দে শ বি দে শে ০০ বে ড়া ই ঘু রে০ ০

॥ গা গা মগা । রা সা রসা । ণধ্া -া ণধ্া । -া ধ্া ণ্া ।

কো থা য়০ পা বো ০০ তা ০ রে ০ আ মার

। সা সরা -গা । রা গা -রসা । -ণ্া সা -া । -রা গা ।

ম নে০ র মা নু ০ষ যে রে ০ ০ ০ ৩০

বাংলা গানের অন্যতম জনপ্রিয় গান ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি” যা রচিত হয়েছিল শিলাইদহের ডাক-পিয়ন গগন হরকরার রচিত গান “আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে” গানের সুর অনুসরণে। বাংলা ১৩০৭ সালে বৈশাখ মাসে সরলা দেবী চৌধুরানী তাঁর শতগান সংকলন গ্রন্থে গগন হরকরা রচিত গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। গনন হরকরার এ গানটির সুর রবীন্দ্রনাথকে এতোটাই প্রভাবিত করেছিল যে তিনি এ সুরে গান রচনার পাশাপাশি তৎকালীন পত্রিকায় গগন হরকরার গানের বাণী প্রকাশ করেছিলেন। উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, এ গানটি গগন হরকরার মৌলিক কোনো সুর নয়, বরং ঐতিহ্যবাহী বাউল সুরে সুরারোপিত।

গান

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে ॥...

॥	সা	রা	গা	গা	।	গা	গা	গা	গা	।	গা	-া	গা	গা	।	[গ]রা	গা	মা	-া	।
	জ	ন	গ	ণ		ম	ই	অ	ধি		না	০	য়	ক		জ	ছ়	হে	০	
॥	[ম]গা	-া	গা	গা	।	রা	-া	রা	রা	।	[স]ন্া	-রা	সা	-া	।	-া	-া	সা	-া	।
	ভা	০	র	ত		ঋ	০	গ্য	বি		ধা	০	তা	০		০	০	প	ন্	
॥	[স]পা	-া	পা	পা	।	-া	পা	পা	-া	।	পা	-া	পা	পক্ষা	।	[ক্ষ]পা	- ক্ষা	[ধ]পা	-া	।
	জা	০	ব	সি		ন্	ধু	গু	জ		রা	০	ট	ম		রা	০	ঠা	০	
॥	মা	-া	মা	মা	।	মা	-া	মা	গা	।	[ম]রা	-মা	গা	-া	।	-া	- া	-া	-া	।
	দ্রা	০	বি	ঙ		উ	ৎ	ক	ল		ব্	ঙ্	গ	০		০	০	০	০	
॥	সগা	-া	গা	গা	।	গা	-া	গা	রা	।	[র]পা	পা	পা	-মা	।	[প]মা	- া	মা	-া	।
	বি	ন্	ধ	হি		মা	০	চ	ল		য	মু	না	০		গ	ঙ্	গা	০	
॥	গা	-া	গা	গা	।	[গ]রা	রা	রা	রা	।	[স]ন্া	-রা	সা	-া	।	-া	- া	-া	-া	।
	উ	চ্	ছ	ল		জ	ল	ধি	ত		র	ঙ্	গ	০		০	০	০	০	

॥ গা গা গা গা । গা -া গা -মা । ^{ম}রা -গা মা -া । -া -া -া -া ।
ত ব শু ভ না ০ মে ০ জা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০

॥ ^{ম}গা মা পা পা । ^{ম}পা -া ঈা গা । ^{গ}রা -মা গা -া । -া -া -া -া ।
ত ব গু ভ আ ০ ডশ ষ মা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০

॥ ^{স}গা -া গা -া । রা রা ^{গ}রা রা । ^{র}ন্া -রা সা -া । -া -া -া -া ।
গা ০ হে ০ ত ব জ ছ গা ০ থা ০ ০ ০ ০ ০

॥ ^{স}পা পা পা পা । পা -া পা হ্মা । পা -া পা পা । ^{প}হ্মা ধা ^{ধ}পা -া ।
জ ন গ ন ম ঙ্ গ ল দা ০ য় ক জ য় হে ০

॥ মা -া মা মা । ^{ম}গা -া গা গমা । ^{গ}রা -মা ^{ম}গা -া । -া -া না না ।
ভা ০ র ত ভা ০ গ্য বি০ ধা ০ তা ০ ০ ০ জ য়

॥ ^{ন}র্সা -া -া -া । -া -া $^{র্স}$না ধা । ^{ধ}না -া -া -া । -া -া পা পা ।
হে ০ ০ ০ ০ ০ জ ছ হে ০ ০ ০ ০ ০ জ য়

॥ ^{প}ধা -া -া -া । -া -া -া -া । ^{ধ}সা সা সা রা । গা গা ^{গ}রা গা ।
হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জ য় জ য় জ য় জ য়

॥ মা -া -া -া । -া -া -া -া ।
হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৩১

বর্তমান বিশ্লেষিত গানটি স্বরবিতানের ষট্‌চত্বারিংশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত গ্রন্থে গানটির রাগ তালের কোনো নির্দেশ নেই। তবে সুধীর চন্দ এ গানের রাগ তালের নির্দেশ করেছেন ইমন-কাহারবা।

পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় গানটিতে ইমন রাগের বেশকিছু স্বরবিন্যাস প্রয়োগ হলেও ব্যতিক্রমী স্বরবিন্যাসও চোখে পড়ে।

- সারেগারেগামা
- মাগারেমাগা
- গারেপামাগা
- গা,মারেগামা,পামাগারেমাগা ইত্যাদি।

  গানটি বিশ্লেষণ করলে আরো প্রতীয়মান হয় যে, গানটির ‘জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় হে’ পংক্তিতে কীর্তন সুরের আভাস বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।

গান

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়, আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,   নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

॥	র্সা	-া	র্সা	।	না	-া	না	।	ধা	-া	ধা	।	ধপা	পা	-া	।
	স	ং	ক		টে	০	র		বি	০	হ্ব		ল	তা	০	
।	সা	রা	গা	।	গা	-া	রা	।	সা	-া	-া	।	-া	-া	-া	।
	নি	জে	রে		অ	০	প		মা	০	০		০	০	ন্	

॥	[স]গা	-া	গা	।	গা	-া	গা	।	গা	-া	গা	।	রা	-া	সা	।
	স	ঙ্	ক		টে	০	ও		ক	ল্	প		না	০	তে	
।	সা	রা	গা	।	গা	-া	রা	।	পা	-া	-া	।	পা	-া	-া	।
	হো	য়ো	না		প্রি	০	ছ		মা	০	ণ্		আ	০	০	
।	সা	রা	গা	।	-ক্ষা	-পা	-ধা	।	[ধ]পা	-া	-া	।	-া	-া	-া	।
	আ	০	০		০	০	০		হা	০	০		০	০	০	
।	[প]র্সা	-া	র্সা	।	-র্সা	-না	র্রা	।	র্সা	-া	-া	।	-া	-া	-া	।
	মু	ক্	ত		ক	০	রো		ভ	০	০		০	০	য়	
।	র্সা	র্গা	র্গা	।	-র্রা	-া	র্রা	।	র্সা	-া	র্সা	।	না	-া	ধা	।
	আ	প	না		মা	০	ঝে		শ	ক্	তি		ধ	০	রো	
।	ধা	র্সা	না	।	না	-া	ধা	।	পা	-া	-া	।	পা	-া	-া	।
	নি	জে	রে		ক	০	রো		জ	০	য়		আ	০	০	
।	সা	-রা	-গা	।	-ক্ষা	-পা	-ধা	।	[ধ]পা	-া	-া	।	-া	-া	-া	।
	আ	০	০		০	০	০		হা	০	০		০	০	০	

[৩২]

আমাদের গবেষণার বর্তমান বিশ্লেষিত গানটি ইমন রাগে বাঁধা। এ গানের তৃতীয় ও ষষ্ঠ স্বরবিন্যাসে আরোহ গতিতে খুব সুন্দরভাবে কড়িমধ্যমের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যদিও কল্যাণ রাগের পরিচয় অনুযায়ী আরোহণে কড়িমধ্যম বর্জিত স্বর। তবে প্রাচীনকালে এ রাগের আরোহনে কড়িমধ্যমের স্বল্প প্রয়োগ বিধিসম্মত ছিল। এ প্রসঙ্গে সংগীতাচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এর উক্তি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য–

> 'প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়ালের মধ্যে স্বল্প পরিমানে কড়ি মধ্যম ও নিষাদের ব্যবহার আরোহনেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এই ব্যবহার সংগত কারন নিয়ে এবং রাগরূপের নিজস্ব স্মৃতির প্রভাব মহিমায় প্রতিকরূপেই ছিল। তার পর ইমন রাগের সৃষ্টি হওয়ার পার্থক্য রক্ষার সহজতম উপায়কে অনুসরন করে কল্যানের আরোহন থেকে কড়ি মধ্যমকে বাতিল করে দেওয়ার অবশ্যক হয়ে পড়ে।'[৩৩]

এ গানের ২টি অন্তরার স্বরবিন্যাস প্রায় একই।

পাগাপাক্ষধা, পাগাপাক্ষাধা, পাগাপাক্ষাধা, পাধানি, ধানিধাপা

গানটি বিশ্লেষণ করে আরো দেখা যায় যে স্বরবিন্যাসে বর্তমান প্রচলিত ইমন রাগের চলনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। তবে পাক্ষাধা, বিন্যাসটি কল্যাণ রাগের প্রাচীন ধ্রুপদের বন্দিসে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের সাথে অঙ্গ/রাগ নির্দেশ করে তালিকা করা হলো।

নং	গান	অঙ্গ/রাগ
১.	আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি	বাউল
২.	ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।	বাউল (রাগ পিলু)
৩.	যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।	বাউল
৪.	তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,	বাউল
৫.	নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।	বাউল (রাগ বিভাস)
৬.	আমি ভয় করবো না ভয় করবো না।	বাউল (রাগ বিভাস)
৭.	আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি	বাউল (বিভাস)
৮.	যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!	বাউল
৯.	যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু	বাউল
১০.	ওরে, তোরা নেই বা কথা বলবি,	বাউল
১১.	মা কি তুই পরের দ্বারের পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?	বাউল
১২.	ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।	বাউল
১৩	ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে– ওরে ভাই,	বাউল (স্বরলিপি নাই)
১৪.	রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে?	বাউল
১৫.	ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বলে ।	বাউল
১৬	খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে।	বাউল
১৭.	যদি তোর ভাবনা থাকে, ফিরে যা না	বাউল

১৮. এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী ॥	সারি
১৯. আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে	রামপ্রসাদী
২০ বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল–	কীর্তণ
২১. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে	টপ্পা (ভৈরবী)
২২ অয়ি ভূবনমনোমোহিনী, মা	ভৈরবী
২৩ নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার–	ভৈরবী
২৪. আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।	ভৈরবী
২৫ ওরে, নূতন ঘুগের ভোরে	ভৈরবী
২৬ আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,	ভৈরবী/কালাংড়া
২৭. আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে	ইমন-ভূপালী (মিশ্র সুর)
২৮ আজি এ ভারত লজ্জিত হে,	ভূপালী
২৯ সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান	ইমন কাল্যাণ
৩০ জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।	ইমন
৩১ মাতৃমন্দির-পূন্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জল আজ হে	ইমন কল্যান
৩২ এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো।	ইমন
৩৩ চলো যাই চলো যাই চলো যাই–	খাম্বাজ
৩৪ বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান–	খাম্বাজ
৩৫ আপনি অবশ হলি, তব বল দিবি তুই কারে?	মিশ্র রামকেলি
৩৬ দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী	মিশ্র কেদারা

৩৭ শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান।	মিশ্রমল্লার
৩৮ আগে চল্ আগে চল্ ভাই!	বেহাগ
৩৯ বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই !	বেহাগ
৪০. ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,	বেহাগ খাম্বাজ
৪১. হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে	শঙ্করা
৪২. আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।	হাম্বির
৪৩ আমায় বলো না গাহিতে বলো না।	কাফি
৪৪. এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভূ, তব শুভ আর্শীবাদ	সুরট দেশ
৪৫. জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে	হাম্বির
৪৬ সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে?	স্বরলিপি নেই

রবীন্দ্রনাথের এই সৃষ্টি-সাধনা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গভীর। তাঁর সৃষ্ট স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সুরের সরলতা। কারণ তিনি এ গানগুলোর ভাব ও বাণী গণমানুষের কাছে পৌঁছে দিবার জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন। এ গানগুলোতে সুরের বৈচিত্র্য থাকলেও তা যেনো সাধারণ গণ-মানুষের উপযোগী করেই সৃষ্টি। কেননা তিনি এ পর্যায়ের গানে তাঁর শৈল্পিক নিপুণতার যে ছবি এঁকে গেছেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে উদ্দীপ্ত, স্বদেশের প্রতি প্রেম, স্বদেশের রূপবর্ণনা, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশমুক্তির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করণ। এ গানগুলোর বাণীতে কবির সমন্বয়বাদী চেতনার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যপক ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বলাবহুল্য রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার লোকসংগীত, বাউল গান এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরকে ব্যবহার করে স্বদেশ পর্যায়ের গানের দৈহিক গঠন নির্মাণ করেছেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এতে তাঁর নিজস্ব মেধা ও মননের ছাপে তা হয়ে উঠেছে একেবারে রাবীন্দ্রিক। তিনি স্বদেশ পর্যায়ের গানের মধ্যে বেশিরভাগ গানে বাউল সুরের ব্যবহার করেছেন। তবে তাতে তাল ও সুর সংযোজনে যে পাণ্ডিত্য দেখিয়ে রাবীন্দ্রিক ঘরানা সৃষ্টি করেছেন তা সরাসরি বাউল না বলে রাবীন্দ্রিক বাউল বলাই শ্রেয়। তবে এ কথা বলে রাখা দরকার যে বেশকিছু গানে তিনি বাণীর ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে মূল গানের হুবহু সুর অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া তিনি তাঁর গানে বাণী অনুসারে রাগের মিশ্রন যেমন করেছেন তেমনি বেশকিছু ক্ষেত্রে রাগের বিপ্রতিকতাও ঘটিয়েছেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে বাংলা স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সংগীত তিনি সৃষ্টি করে গেছেন, তা একবিংশ শতাব্দিতেও সংকটময় মূহুর্তে বাঙালি হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে বেজে উঠে বিচিত্রভাবে।

তথ্যসূত্র

১. প্রভাতকুমার গোস্বামী [উদ্ধৃতি], *ভারতীয় সংগীতের কথা*, আদিনাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬ (পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণ), পৃষ্ঠা, ৬৫

২. প্রদীপকুমার ঘোষ, *সংগীতশাস্ত্র সমীক্ষা (২য় পর্ব)*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ: ২০, ২১, ২৩ সংগ্রহ- প্রিয়াংকা গোপ পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ *"উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের বৈচিত্র্য ও নান্দনিকতা"* অপ্রকাশিক- পৃষ্ঠ, ৪০।

৩. https://dpbhowmik.wordpress.com/2018/11/10 ধ্রুপদ-উৎপত্তি ও ইতিহাস visited on 01.10.2022.

৪. প্রদীপকুমার ঘোষ, *সংগীতশাস্ত্র সমীক্ষা (২য় পর্ব)*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা, ৩১

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান সপ্তচত্বারিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনি, পৃষ্ঠা, ৩৬-৩৮।

৬. প্রদীপকুমার ঘোষ, সংগীতশাস্ত্র সমীক্ষা (২য় পর্ব)পৃষ্ঠা, ২৯

৭. onushilon.org/music/gen/kheyal.htm visited on 01.29.2022.

৮. দেবব্রত দত্ত, সংগীত তত্ত্ব [শাস্ত্রীয় তথা ভাব সংগীতপ্রসঙ্গ] প্রথম খণ্ড, ব্রতী প্রকাশনী, ২০১৫ পৃষ্ঠা, ২১৫

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান সপ্তচত্বারিংশ খণ্ড,পৃষ্ঠা, ১৮-১৯।

১০. শান্তি দেব ঘোষ, "রবীন্দ্রসঙ্গীত', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, পুর্ণমুদ্রণ পৌষ, ১৪০৮, পৃষ্ঠা, ৯২

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান সপ্তচত্বারিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪-২৬।

১২. সুনির্মল ভট্টচার্য, *রবীন্দ্র সংগীতের ভাঙ্গাগানের উৎস সন্ধানে*, পৃষ্ঠ, ১৬৬-১৬৭।

১৩. http://onushilon.org/music/gen/kirtton.htm visited on 02.10.2022.

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান ষট্চত্বারিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ০৭-০৮।

১৫. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বির্বতন*, বাংলা একাডেমী ঢাকা পৃষ্ঠা, ১১৩।

১৬. https://www.kaliokalam.com/ নিধুবাবুর গান : সময় ও সমাজের প্রতিচ্ছবি visited on 02.10.2022.

১৭. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বির্বতন*, পৃষ্ঠা, ১১৭

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান ষট্চত্বারিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনি, পৃষ্ঠা, ২৩-২৫।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান ষট্চত্বারিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩০-৩১।

২০. সঙ্গীতাচার্য্য- শ্রী সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাদ্যায়, *রাগ অভিজ্ঞান*, ব্যাক্তিগত প্রকাশনা, পৃষ্ঠা, ১৪২

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান সপ্তচত্বারিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৫-১৭।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান সপ্তচত্বারিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২০-২৩।

২৩. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ন ভাত খণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি চতুর্থ খণ্ড*,কলকাতা, পৃষ্ঠা, ৯৫।

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান ষট্‌চত্বারিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৯-৭১।
২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান ষট্‌চত্বারিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৭-৩৯।
২৬. ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, লোক সংগীত, প্যাপিরাস প্রকাশন, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা, ৩২
২৭. ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, বাংলা গানের ধারা, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ, ১৯৯৩। পৃষ্ঠা, ৫৬
২৮. ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, লোক সংগীত, প্যাপিরাস প্রকাশন, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা, ৪১
২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান ষট্‌চত্বারিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ০৯-১১।
৩০. সম্পা. কুমকুম ভট্টচার্য, *শতগান*, সরলা দেবী, সূবর্ণরেখা ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা, পৃষ্ঠা, ২১৫-২০১৬
৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান সপ্তচত্বারিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ০৫-০৭।
৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা পৃষ্ঠা, ১৫-১৬।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানে তাল পর্যালোচনা

মানব চৈতন্যে ভাবউদ্দীপনা জাগাতে সংগীত শক্তিশালী বাহক হিসেবে কাজ করে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রতিভা বিকাশের অন্যতম প্রধান বাহন হলো সংগীত। তাঁর সংগীত সৃষ্টি সৌকর্য্যের সাথে সংগীত গবেষণাও সমালোচক ও গবেষকদের কাছে অন্যতম আদর্শ স্বরূপ। বলাবাহুল্য তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গানের মাধ্যমে তৎকালীন ভারতবর্ষের জনগণ ও শিল্পীসমাজ চেতনালাভ করে। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের গানে সুরের চেয়ে বাণীর গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন। আর তালের ক্ষেত্রে তিনি তেমন পাণ্ডিত্য দেখান নি। কেননা সংগীত শিল্পকে তিনি রাজনৈতিক ও স্বদেশ আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই সুরের ক্ষেত্রে যেমন বাউল বা লোক সুরের তেমন তালের ক্ষেত্রে কাহারবা, দাদরা, একতালকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা বিশেষভাবে জানি যে, সংগীতের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হলো তাল। আর তাল হলো সংগীত, বাদ্য ও নৃত্যের গতি বা লয়ের স্থিতিকাল। সাধারণত তাল রচনা করা হয় মাত্রার সমষ্টি দিয়ে। তাল দু প্রকার হয়ে থাকে। যথা–

১. সমপদী

২. বিষমপদী

১. সমপদী– তালের মাত্রা বিভাজন সমান হলে তাকে সমপদী তাল বলে। যেমন- দাদরা, কাহারবা, একতাল, ত্রিতাল, চৌতাল ইত্যাদি।

২. বিষমপদী– তালের মাত্রা বিভাজন অসমান হলে তাকে বিষমপদী তাল বলে। যেমন– তেওড়া, রূপক, ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, ধামার, ঝাঁপতাল ইত্যাদি।

তাল সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে তাল বিভিন্ন বিভাগে হতে পারে। যেমন ত্রিতালের ৪টি বিভাগ, দাদরা ও কাহারবা তালের ২টি বিভাগ রয়েছে এ বিভাগগুলোকে তাল বিভাগ বলা হয়। যেখান থেকে অর্থাৎ যে মাত্রা থেকে তাল শুরু হয় তাকে সাধারণত তালের সম বলে অভিহিত করে। তালের প্রথম বিভাগের প্রথম মাত্রায় তালি দিয়ে সম দেখানো হয় তাই সেগুলি তালি আর তালের যে বিভাগে তালি দেওয়া হয় না তা খালি বা ফাঁক নামে পরিচিত। আবার এক এক তালের জন্য এক এক বোলের সমষ্টি তৈরি করা হয়েছে আর সেই বোলের সমষ্টিকে যখন মাত্রা, বিভাগ, তালি, খালি ইত্যাদিতে নিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে বলা হয় ঠেকা। উল্লেখ্য তবলা, পাখোয়াজ বা খোল বাজানোর জন্য নির্দিষ্ট বোল থাকে। যেকোনো ধরনের তাল-বাদ্য যন্ত্রের ছ্ট সমূহকে বলা হয় তেহাই। সংগীতে তালের গুরুত্ব অপরিসীম।

সংগীতে তালের গুরুত্ব

১. তাল সংগীতের ছন্দের নির্মাণকর্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. তাল ছন্দের আপেক্ষিক লঘুত্ব বা গুরুত্বের নির্ধারক।

৩. তাল সংগীতকে নির্দিষ্ট সময়ের ফ্রেমে বেঁধে দেয় ও সংযম রক্ষা করে ।

৪. তালের মধ্যদিয়ে একটি সংগীতের স্বরলিপি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

৫. তাল সংগীতের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যকে জাগ্রত করে।

৬. তাল সংগীতের সমতা রক্ষা করে সুশৃঙ্খলতা বজায় রাখে।

৭. সংগীতের চলনভঙ্গির সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তাল বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৮. তাল একটি নিয়মবদ্ধ শৈলী তাই এর উত্থানে পতনে গায়ক বাদক ও শ্রোতাকে উল্লসিত করে।

৯. তাল সংগীতে বিভিন্ন রস প্রকাশে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে।

১০. তাল সংগীতের মাধুর্য্য সৃষ্টির অন্যতম প্রধান নিয়ামক।

গীত, বাদ্য ও নৃত্য এ সবই তালের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তাল বিশেষজ্ঞ বিমলাকান্ত রায় চৌধুরীর মতে–

> প্রতিষ্ঠার্থক তল্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ করিয়া তাল শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত প্রকৃতি ক্রিয়াদ্বারা পরিমিত যে কাল, যা গীত বাদ্য ও নৃত্যকে নিয়মিত করে, তাহাকেই তাল বলা হয়। বিশ্রান্তি বা বিরতি যুক্ত সশব্দ বা নিঃশব্দ ক্রিয়াদ্বারা মধ্যকালে তালের মান বা পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রচলিত সঙ্গীতে লয় এবং মাত্রা-বিশিষ্ট একটি ছন্দ-রচনাকে তাল বলা হয়, এই রচনা বিশেষ বাণী বা বোলের মাধ্যমে রচিত হয়। বিভিন্ন লয় এবং মাত্রা-সমষ্টিতে নানারূপ ছন্দোবৈচিত্র্যে প্রস্বনের তারতম্যে অসংখ্য তালের উৎপত্তি হইয়াছে। অপর পক্ষে প্রস্বনের স্থানগুলিকেই তাল বলা হয়।[১]

সংগীতে তালের গুরুত্ব অপরিসীম। এই তাল সম্পর্কে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন–

> সংগীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সব চেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল লইয়া। গানবাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষয় মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করিয়াই বাড়িয়া ওঠে। স্বয়ং সংগীত যখন পরবশ তখন তাল বলে 'আমাকে দেখো', সুর 'বলে আমাকে। কেননা, দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করিয়াছে– দুই মধ্যস্থের ঠেলাঠেলি– কর্তৃত্বের আসন কে পায়–মাঝে হইতে সংগীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে। তাল জিনিসটা সংগীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশি সে কথা বলাই বাহুল্য।[২]

রবীন্দ্রসংগীতে যে সুর ও বাণীর বৃহৎ বিস্তার লক্ষ্যণীয় তাতে রয়েছে রাগের প্রভাব, রয়েছে লোকসংগীতের ছোঁয়া, সেই সাথে আছে বিশ্ব সাহিত্যের ভাব ও বাণী। রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো গানে আবার বিদেশী সুর সংযোজনের মাধ্যমে বিচিত্র ভাব প্রকাশ করেছেন। আবার এই সব প্রচলিত ঘরাণার বেড়াজাল ভেঙ্গে সৃষ্টি করেছেন নতুন ছন্দ ও তাল। তাল ছাড়া কোনো গান সৃষ্টি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের মুক্ত ছন্দের বেশকিছু গান রচিত হয়েছে যা তালে গাওয়া না হলেও গানগুলির স্বরলিপি নির্দিষ্ট তালেই বাঁধা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

> "কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটাই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্ব সংসার এমন করে চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছেনা। অতএব কাব্যেই কী আর গানেই কী, এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।"[৩]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ নক্ষত্র থেকে শুরু করে জীব ও জন্তু সকলই একই লয়কে মেনে চলে। আর এ লয় মেনে চলে বলেই এরা এখনো টিকে আছে। লয়, গতি একই রকম না হলে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পারস্পরিক ধাক্কায় ধ্বংস হয়ে যেতো।

বলাবাহুল্য সংগীতের তাল ও লয়ের চেয়ে মূখ্য গানের ভাব প্রকাশ করা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গায়নশৈলী ও তাল লয়ের ভাবনা সমন্ধে শান্তিদেব ঘোষের স্মৃতিচারণ উল্লেখ করা যেতে পারে–

> " যারা গুরুদেবের সঙ্গ লাভের সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা জানেন যে গুরুদেব আপন মনে গান গাইবার সময় কখনো দ্রুত লয়ে গান গাইতেন না, সে বাংলা গানই হোক, আর অল্প বয়সে শেখা হিন্দি গানই হোক..... লক্ষ্য করে দেখেছি যে তিনি সেসব গান গাইবার সময় প্রায়ই বাঁধা তালে বা ছন্দে গাইতেন না, দ্রুত লয়ের গান ছাড়া। বহু নাটকের অভিনয়েও তাঁকে গান গাইতে শুনেছি তখনো দেখেছি ঢিমে লয়ের গানে বাঁধা-ছন্দের নিয়ম একেবারে রাখেননি; গান গাইতেন স্বাভাবিক কথা বলার ছন্দে, যেন গানেই কথা বলছেন। এইপ্রকার গায়কী পদ্ধতীটি খুবই মনোহর বলে মনে হত। তাতে গানের ভিতর দিয়ে ভাবটি খুবই সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেত। [৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে তাল প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তৎকালীন প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় সব তালেই তিনি গান বেঁধেছেন। ভারতবর্ষের আর কোনো সংগীত রচয়িতার গানে তাল ব্যবহারে এমন বৈচিত্র্য দেখা যায় না। সাধারণ দাদরা কাহারবা তাল ব্যবহারেরও নানা-বৈচিত্র্য এনেছেন। দাদরা তালের প্রতিটি মাত্রা থেকেই যেমন গান রচনা করেছেন তেমনি তালের ফাঁক টা না রেখে টানা ছয় মাত্রায়ও গান রচনা করেছেন। যেমন 'একটুকু ছোঁয়া লাগে' গানটি। আবার কাহারবা তাল নিয়েও কবি বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। অবশেষে তিনি ৮ মাত্রা বিশিষ্ট কাহারবা তালের ৪/৪ ছন্দ বাদ দিয়ে ৪ মাত্রা নিয়ে ২/২

ছন্দে গানে সুরারোপ করেন। এমনকি টানা ৪ মাত্রায়ও গান রচনা করেন। আবার কিছু শাস্ত্রীয় তালের প্রাচীন মাত্রাবিভক্তি না মেনে নিজের মতো মাত্রা বিভাজন করে গানে সুরারোপ করেন। ঝাপতালের ফাঁক অংশ ফেলে দিয়ে প্রথম অর্ধেক নিয়ে তিনি অর্ধঝাঁপ তালের প্রচলন করেন। সেই সাথে তিনি এই তালে অনেক গানে সুরারোপ করেন। যে গানগুলি পরবর্তী সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে। প্রসংগত উল্লেখ্য পরবর্তীতে বেশকিছু সংগীত স্রষ্টা এ তালে গান রচনা করেন।

> " কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কী উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দেই। মনে করা যাক, আমার গানের কথাটি এই–
>
> কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
> চোখের জলে আঁখি ভরভর।
> দোদুল তমালেরি বনছায়া
> তোমার নীলবাসে নিল কায়া,
> বাদল নিশীথেরি ঝরঝর
> তোমার আঁখি পরে ভরভর।.....
>
> এই ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুশি ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন, এ ছন্দের এক অংশে সাত আর এক অংশে চার, ইহাতে কিছুতেই তাল মেলেনা। আমার জবাব এই, তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ, ছন্দটাতে দোষ হয় নাই।"[৫]

মূলত রবীন্দ্রনাথ তাল সম্পর্কে এ ভাবনা থেকেই মোট ৬টি নূতন তাল সৃষ্টি করলেন। 'কাব্য সবসময় কেন তালের দাসত্ব মেনে চলবে? কাব্যের দাবি মেটাতে, কাব্য ঠিক রাখতেই কাব্যানুসারে গানে সুর দিতে গিয়ে নতুন তাল সৃষ্টি করলেন। 'তিনি সৃষ্টি করলেন ২/৪ ছন্দে ষষ্ঠি, ৩/২ ছন্দে ঝম্পক, ৩/২/৩ ছন্দে রূপকড়া, ৩/২/২/২ ছন্দে নবতাল, ৩/২/২/৪ ছন্দে একাদশী ও ২/৪৪/৪/৪ ছন্দে নবপঞ্চ তাল'[৬]।

নিম্নে মাত্রা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে গানের উদাহরণসহ রবীন্দ্র সৃষ্ট, রবীন্দ্র প্রবর্তিত ও স্বদেশ পর্যায়ের গানে ব্যবহৃত তাল সমূহের রাবীন্দ্রিক ঠেকা সহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. ঝম্পক–

পাঁচ মাত্রা বিশিষ্ট এ তাল মূলত ৩/২ ছন্দে বিষমপদী তাল। যা মূলত রবীন্দ্র সৃষ্ট তাল। রবীন্দ্রনাথ এই তালে ২৫টি গানে সুরারোপ করেন।

তালের বোল– ধি ধি না। ধি না

গানের উদাহরণ "আজি ঝড়ের রাতে তোমার /প্রকৃতি-৯৫", "কোথা বাইরে দূরে যায় র উড়ে /প্রেম-৩২৭", "চপল তব নবীন আঁখি দুটি /প্রেম-৭৭", "তোমার কটি-তটের ধটি /নাট্যগীতি-৮৩", "নিবিড় অমা-তিমির হতে /প্রকৃতি-২৪২", "বাহির পথে বিবাগি হিয়া /প্রেম-৩২১", "যেতে যেতে একলা পথে /পূজা-২০৫", "শুভ্র নব শঙ্খ তব গগন ভরি বাজে /পূজা-২৬৪"।

২. ষষ্ঠি তাল

ষষ্ঠি ছয় মাত্রা বিশিষ্ট ২। ৪ ছন্দের একটি তাল। এটি রবীন্দ্র সৃষ্ট তাল হিসেবে পরিচিত। তবে ষষ্ঠি তালের ন্যায় দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিতে ২। ৪ ছন্দের একটি তালের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে তার বোল-বাণী আলাদা। রবীন্দ্রনাথ সার্থকতার সাথে তার মোট ৩৯ টি গানে এ তালের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এ প্রসংঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ তাঁর রবীন্দ্রসংগীত' নামক গ্রন্থে লিখেছেন।

> "গুরুদেব, এই ছন্দের তালটি তাঁর গানে ব্যবহার করলেও তার নামকরণ তিনি করে যান নি। ২-৪ মাত্রার, কর্ণাটি রূপক তালের ছন্দে তিনি, ১৩২৯ সালে প্রথম যে গানটি রচনা করেছিলেন সেটি হল, "আমার যদিই বেলা যায় গো বয়ে"। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এর পূর্বে তিনি এই ছন্দ বা তালটি তাঁর গানে ব্যবহার কেন করেন নি? এর কারণ হল, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর, এই ছন্দটির সঙ্গে গুরুদেবের ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হবার সুযোগ।"[৭]

এটি একটি ৬ মাত্রা বিশিষ্ট রবীন্দ্র সৃষ্ট তাল। ২/৪ ছন্দ।

তালের বোল– ধা গে। ধা গে তে টে

গানের উদাহরণ– নিদ্রাহারা রাতের এ গান

শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে

ষষ্ঠী তালের ২/৪ ছন্দকে উল্টে ৪/২ ছন্দে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন মাত্র একটি। যেটাকে অনেকে 'উল্টা ষষ্ঠী' বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

তালের বোল– ধা গে তে টে। ধা গে

গানের উদাহরণ– হৃদয় আমার প্রকাশ হল

এতালের সবিনয় রায়-কৃত ঠেকা হলো

তবলা (মধ্য) । ধা তেৎ । ধাগে তেটে ধিন্ না ।

তবলা (দ্রুত): । ধা গে । ধা গে ধিন্ না।

৩. রূপকড়া

রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি রূপকড়া তাল। এ তালটি ৮ মাত্রার ৩।২।৩ ছন্দে বিন্যাস । এতে ৩টি বিভাগ আছে; ১ম বিভাগে ৩টি , ২য় বিভাগে ২টি ও ৩য় বিভাগে আবার ৩টি মাত্রা রয়েছে। উল্লেখ্য রবীন্দ্র সৃষ্ট এ তালেও বাংলা গানের অনেক গীতিকার সংগীত রচনা করেন।

১	২	৩		৪	৫		৬	৭	৮
ধি	ধি	না	।	ধি	না	।	ধি	ধি	না

৪. নবতাল

রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি নবতাল। যা মূলত ৯ মাত্রা বিশিষ্ট একটি তাল। এর মাত্রা বিভাজন করা হয়েছে ৩।২।২।২ ছন্দে। এ তালটি মূলত ৪টি বিভাগে বিভাজিত । ১ম বিভাগে ৩টি এবং বাকী ৩টি বিভাগে ২টি করে মাত্রা রয়েছে।

১	২	৩		৪	৫		৬	৭		৮	৯
ধি	ধি	না	।	ধি	না	।	ধি	ধি	।	নাগে	তেটে

৫. একাদশী

১১ মাত্রা বিশিষ্ট রবীন্দ্র সৃষ্ট তালের নাম একাদশী। তালের মাত্রা বিভাজন ৩।২।২।৪। এ তালের মোট ৪ বিভাগ আছে। ১ম বিভাগে ৩মাত্রা মাঝের ২টি বিভাগে ২টি করে এবং শেষ বিভাগে ৪টি মাত্রা আছে। এই তালটি অনেকটা প্রাচীন মনিতাল এর মতো।

১	২	৩		৪	৫		৬	৭		৮	৯	১০	১১
ধি	ধি	না	।	ডধ	না	।	ধি	না	।	ধি	ধি	নাগে	তেটে

৬. নবপঞ্চতাল

নবপঞ্চতাল মূলত ১৮ মাত্রা বিশিষ্ট একটি বিসমপদী তাল। যার মাত্রা বিভাজন ২।৪।৪।৪।৪। এই তালে মোট ৫টি বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম বিভাগে ২টি এবং পরের ৪টি বিভাগে মোট ৪টি করে মাত্রা রয়েছে। উল্লেখ্য এ তালে রবীন্দ্রনাথ মাত্র একটি গান রচনা কারেন। গানটি হলো "জননী তোমার করুণ চরণ খানি"।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	গে	ধা	গে	দেন	তা	কৎ	তাগে	দেন	তা
		১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
		তেটে	কতা	গদি	ঘেনে	ধাগে	তেটে	তাগে	তেটে

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন কিছু তাল যেমন ঝাঁপতাল, সুরফাঁক তাল, আড়াচৌতাল প্রভৃতি তালগুলিকে তাঁর কাব্যের ভাব অনুযায়ী পূর্বের মাত্রা বিভাজন ভেঙ্গে নিজস্ব সৃষ্টিশৈলীতে মাত্রা বিভাজন করে গানে সুরারোপ করেন। যেমন-

১. অর্ধঝাঁপ তাল-

অর্ধঝাঁপ হলো ৫ মাত্রার ও ২।৩ ছন্দের রাবীন্দ্র প্রবর্তিত তাল। যার মাত্রা বিভক্তি ঝম্পক তালের সম্পূর্ণ বিপরীত। তালটি ঝাঁপতালের অর্ধেক নিয়ে তৈরি তাই এর নাম অর্ধঝাঁপ তাল। এই তালটি অনেকটা কর্ণাটকী তিস্র-জাতি-রূপক তাল এর মতো।

অর্ধঝাঁপ তালে রবীন্দ্রনাথের ১০টি গান রয়েছে।

তালের বোল– ধি না। ধি ধি না

গানের উদাহরণ : "দীপ নিবে গেছে মম", "পথে চলে যেতে যেতে"

২. সুরফাঁক

সুরফাঁক তাল ১০ মাত্রা বিশিষ্ট তাল। শাস্ত্রীয় সংগীতে এর ছন্দ ২।২।২।২।২। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ তালের শাস্ত্রীয় তালের মাত্রা বিভাজন ফেলে দিয়ে ৪।২।৪ ছন্দে মাত্র বিভাজন তাঁর গানে সুরারোপ করেন।

১	২	৩	৪	।	৫	৬	।	৭	৮	৯	১০
ধা	ঘেরে	নাগ	ধি		ঘেরে	নাগ		গদ	ধি	ঘেরে	নাগ

৩. আড়াচৌতাল

শাস্ত্রীয় সংগীতের ছন্দ বিভাজন না মেনে তিনি তাঁর গানের ভাব প্রকাশের জন্যে আড়াচৌতালকে ২ ।৪ ।৪ ।৪ ছন্দে বিভক্ত করে গান রচনা করেন।

১	২	।	৩	৪	৫	৬	।	৭	৮	৯	১০	।	১১	১২	১৩	১৪
ধা	গে		ধা	গে	দেন	তা		কৎ	তাগে	দেন	তা		তেটে	কতা	গদি	ঘেনে

গান- 'সংসারে কোন ভয় নাহি', 'শুভ্র আসনে বিরাজ' ইত্যাদি।

নতুন নতুন তাল সৃষ্টি করে এবং পুরাতন বেশকিছু তালের মাত্রা বিভাজন করে তাঁর গানে বৈচিত্র্যতা এনেছেন। সেই সাথে প্রাচীন কিছু তালে তাঁর গান সুরারোপ করে সেই তালগুলিকে সমকালীন শিল্পী ও সংগীত স্রষ্টাদের কাছে তুলে ধরেছেন। নব নব তাল সৃজন এবং প্রচলিত ও অপ্রচলিত তালে গান রচনা করে স্বার্থক হয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সৃষ্টি শতবর্ষ পরেও একই ভাবে সমাদৃত এবং উত্তরোত্তর এর জনপ্রিয়তা ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বগামী হয়ে উঠছে।

স্বদেশ পর্যায়ের গানের তাল নির্দেশ

দাদরা তাল

ছন্দ বিভাজন ৩ ।৩।

১টি তালি ১টি থালি ।

দাদরা ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত ছয় মাত্রা বিশিষ্ট সমপদী তাল বিশেষ। এ তালটি মোট দুটি ভাগ যার প্রতি বিভাগে তিনটি করে মাত্রা। তালটিতে প্রথম মাত্রায় একটি তালি ও চতুর্থ মাত্রায় একটি খালি রয়েছে। বাংলা আধুনিক ও লোকগানসহ ভারতবর্ষের বিচিত্র গানে এই তালটির ব্যপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

তালটির তবলার বোল নিচে উল্লেখ করা হলো:

+				০				+
ধা	ধি	না	|	ধা	তি	না	|	ধা
১	২	৩		৪	৫	৬		১

+				০			
ধা	ধি	না	|	না	তি	না	|
১	২	৩		৪	৫	৬	

এই তালের অপর একটি রূপ রয়েছে যা দ্রুত দাদরা নামে বহুল পরিচিত। সাধারণত এটি কোনো স্বতন্ত্র তাল নয়। মূলত মধ্যলয়ের দাদরাকে তিনগুণ করলেই দ্রুত দাদরার রূপটি পাওয়া যায়।

এ তালের বোল নিচে দেয়া হলো

+				০		
ধা	তে	টে	|	না	ধি	না। ধা
১	২	৩		৪	৫	৬

+				০			
ধিনা	ধিন	ধা	|	তেটে	ধিন	না।	ধা
১	২	৩		৪	৫	৬	

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ পর্যায়ের মোট ২৫টি গান দাদরা তালে বেঁধেছেন। গানগুলো হলো–

১. আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি

২. ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা

৩. তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,

৪. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।

৫. নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।

৬. আমি ভয় করবো না ভয় করবো না।

৭. আপনি অবশ হলি, তব বল দিবি তুই কারে?

৮. আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

৯. আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

১০. সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।

১১. হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে।

১২. মা কি তুই পরের দ্বারের পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?

১৩. আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

১৪. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!

১৫. যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু ॥

১৬. ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি।

১৭. ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে– ওরে ভাই,

১৮. ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি

১৯. ওরে, নূতন যুগের ভোরে

২০. রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে?

২১. ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো

২২. ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে

২৩. বিধিব বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান–

২৪. খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে।

২৫. সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে?

কাহারবা তাল

এ তালটি মূলত আট মাত্রায় নিবদ্ধ পূর্ণ একটি সমপদী তাল। এ তাল ৪।৪ মাত্রায় সমান ২টি ভাগে বিভক্ত। এ তালে দুটি বিভাগের মধ্যে একটি তালি ও একটি খালি বিদ্যমান। এ তালটি কাহার্‌বা, কাহেরবা, কার্ফা, ইত্যাদি নামে পরিচিত। পশ্চিমাঞ্চলে এই তালকে ধুমালী বা লাউনীও বলা হয়ে থাকে । এ তালের বিভিন্ন বোল নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

প্রথম

+					০			
ধা	গে	না	তি	।	না	ক	ধি	না
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮

দ্বিতীয়

+					০			
ধা	ধিন্	না	ধিন্	।	না	তিন্	নানা	তেটে
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮

তৃতীয়

+					০			
ধাগ্‌	ধিন্	নাক্‌	ধিন্	।	নাক্‌	থুন্	নানা	তেটে
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮

দ্রুত কাহারবা

+					০				+
ধি	ন	না	ক	।	তে	টে	ধা	০	।	ধিন্
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	

রবীন্দ্রনাথে এ তালে স্বদেশ পর্যায়ের মোট ৮টি গান বেঁধেছেন। গানগুলো হলো–

কাহারবা

১. এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো।

২. অয়ি ভূবনমনোমোহিনী, মা

৩. জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা

৪. নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার–

৫. এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী ॥

৬. জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে

৭. শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান

৮. চলো যাই চলো যাই চলো যাই–

একতাল

একতাল ১২ মাত্রা বিশিষ্ট একটি সমপদী তাল।

এই তালটি তিন প্রকার। যথা:

১. দ্বিমাত্রিক একতাল

২. ত্রিমাত্রিক একতাল

৩. চতুর্মাত্রিক একতাল।

এ তালে মোট চারটি বিভাগ এবং প্রতিটি বিভাগে তিনটি করে মাত্রা। তালটিতে মোট তিনটি তালি ও একটি খালি রয়েছে। উল্লেখ্য যখন বিলম্বিত একতাল বাজানো হয় তখন চার মাত্রা সমান করে টেনে বাজানো হয়, যার ফলে তা ৪৮ মাত্রার মতো মনে হলেও মূলতঃ তা দ্বিমাত্রিক একতাল ১২ মাত্রার একটি বিলম্বিত রূপের ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

তবলার বোল নিম্নরূপ:

	+			২			০			৩			+
I	ধিন	ধিন	ধাগে	তেরেকেটে	থুন	না	কৎ	তা	ধাগে	তেরেকেটে	ধিন	ধা	I ধিন
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১

এ তালের রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের ৮টি গান বেঁধেছেন। গানগুলো হলো–

১. বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই !
২. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
৩. আমায় বলো না গাহিতে বলো না।
৪. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
৫. বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল–
৬. দেশ দেশ নন্দিত কবি মন্দ্রিত তব ভেরী
৭. আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার
৮. আমরা পথে পথে যাব সারে সারে...

তেওড়া

তেওরা তালটি সাত মাত্রার এবং বিষমপদী ছন্দের একটি তাল। এতালের আরেক নাম তেওট। এতে বিভাগ মোট তিনটি। ৩ | ২ | ২ যার প্রথম বিভাগটি তিন মাত্রার এবং পরের দুটি প্রতিটি দুই মাত্রার। এ তালের মোট তিনটি তালি রয়েছে। উল্লেখ্য এ তালে কোনো খালি নেই। এই তালটি ধ্রুপদ এবং খেয়াল- উভয় প্রকার গানেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তবলার বোল

১	২	৩		৪	৫		৬	৭		১
ধিন্	ধিন্	না	|	ধিন	না	|	ধিন্	না	|	ধিন

পাখোয়াজের বোল

১	২	৩		৪	৫		৬	৭		১
ধা	দেন্	না	|	তেটে	কতা	|	গদি	ঘেনে	|	ধা

রবীন্দ্র স্বদেশ পর্যায়ের তেওড়া তালে মাত্র একটি গান রয়েছে। তবে 'আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে' গানটিতে তাল ফেরতায় তেওড়া তালটি স্বল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

গান

১. মাতৃমন্দির-পূণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জল আজ হে

চৌতাল তাল

চৌতাল ১২ মাত্রাবিশিষ্ট একটি সমপদী শাস্ত্রীয় তাল। যার ছয়টি বিভাগে বাঁধা এবং প্রতিটি বিভাগে দুটি করে মাত্রা বিদ্যমান।

এ তালের ১ম, ৫ম, ৯ম ও ১১তম মাত্রায় তালি এবং ৩য় ও ৭ম মাত্রায় খালি আছে। তালটির পাখোয়াজে বাদিত বোল নিম্নরূপ:

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ধা	দেন	তা	কৎ	তাগে	দেন	তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

৯	১০	১১	১২	+
তেটে	কতা	গদি	ঘেনে	I ধা
৯	১০	১১	১২	১

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের মধ্যে মাত্র ১টি গানে এ তাল ব্যবহৃত হয়েছে ।

গান

১. এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভূ, তব শুভ আশীর্বাদ

ত্রিতাল

ত্রিতাল মূলত সংগীতের একটি বহুল ব্যবহৃত ১৬ মাত্রা বিশিষ্ট সমপদী তাল। যার পদ-সংখ্যা = ৪, ছন্দ-বিভাগ = ৪/৪/৪/৪ । এ তালকে ত্রিতাল বা তেতাল বা তেতালা বলার কারণ এ তালে তিনটি তালি ও একটি খালি বা ফাঁক রয়েছে। এটি মূলত খেয়াল গানে তবলায় সংগত হয়ে থাকে। তালটির ঠেকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

+		২		০		৩		+
ধা ধিন ধিন ধা		ধা ধিন ধিন ধা		না তিন তিন না		তেটে ধিন ধিন ধা		ধা
১ ২ ৩ ৪		৫ ৬ ৭ ৮		৯ ১০ ১১ ১২		১৩ ১৪ ১৫ ১৬		১

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের মাত্র ১টি গান রয়েছে।

গান

১. আজি এ ভারত লজ্জিত হে/ হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে॥

ফেরতা

এটি কোনো স্বতন্ত্র তাল নয়। মূলত একাধিক তালের যুগল সম্মিলনে তাল সৌন্দর্য্যকে ফেরতা তাল বলে অভিহিত করা হয়। বাংলা গানে প্রায় সকল স্বার্থক সুরকারগণ এ তাল ব্যবহার করেছেন নিজ নিজ সৃষ্টি-বৈভবে। রবীন্দ্রনাথ এ তালের ব্যবহার করেছেন তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের গানে। তবে তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের মাত্র একটি গানে ফেরতা তালের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ গানটি চৌতাল ও তেওড়া তালের সমন্বয়ের বাঁধা। গানটি হলো-

১. আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে/কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া

স্বদেশ প্রেমের শেকড় মানুষের মননে ও মনুষ্যত্বে। দেশপ্রেম মানুষের মন থেকে মুছে দেয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি, মানুষের মনে বয়ে আনে মহত্ত্ব। আর এই স্বদেশ নিয়ে উপমহাদেশে সৃষ্টি হয়েছে শত সহস্র শিল্প ও সাহিত্য। এ অভিসন্দর্ভে পূর্বে উল্লেখ্য আছে; রবীন্দ্র স্বদেশ তপস্যার সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে সংগীতে। স্বদেশ পর্যায়ে মাত্র ৪৬টি গান ও জাতীয় সংগীত পর্যায়ের ১৬টি গান ছাড়াও তাঁর আরো বেশকিছু গানে স্বদেশ প্রেমের মহিমা সরাসরি প্রকাশিত হয়েছে। এ গানগুলোর মধ্যদিয়ে জনগণ পেয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অবিনাশী প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের গান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর গানগুলোতে দ্রুত লয়ের প্রাধান্য খুবই কম কিন্তু স্বদেশ পর্যায়ের বেশকিছু গানে দ্রুত লয়ের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যসূত্র

১. বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, *ভারতীয় সঙ্গীতকোষ*, ইমদাদখানি স্কুল অব্ সিতার, কলকাত া(১৯৮৪), পৃষ্ঠা, ৪৯।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীত চিন্তা*, নবযুগ প্রকাশনী,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ২০১৬, পৃষ্ঠা, ৪৪।

৩. প্রবন্ধ– সংগীতও ছন্দ, *রবীন্দ্র সমগ্র-খণ্ড: ১১*, পাঠক সমাবেশ-২০১১, পৃষ্ঠা,৫৯১।

৪. শান্তিদেব ঘোষ,*রবীন্দ্র সংগীত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন, ১৪১৫ পৃষ্ঠা, ১৩৮।

৫. প্রবন্ধ– সংগীতও ছন্দ, *রবীন্দ্র সমগ্র-খণ্ড:*, তদেব পৃষ্ঠা, ৫৯০।

৬. আহমেদ শাকিল হাসমী, *রবীন্দ্রনাথের তাল-ভাবনা ও প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা*, সাহিত্যসন্দর্ভ, বাংলা ডিসিপ্লিন ॥ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংখ্যা-২০২০,পৃষ্ঠা, ৬৪।

৭. শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্র সংগীত*, পৃষ্ঠা, ১৪২-৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

তুলনামূলক পর্যালোচনা

বর্তমান অধ্যায়টিতে তুলনামূলক বিশ্লেষণকেই গুরুত্ব দেয়া হবে। এ পদ্ধতি বিশ্লেষণ, অধ্যয়ন এবং পরীক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর তাই এই পদ্ধতিটিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা হয়। শিল্প, সাহিত্যে তুলনামূলক পদ্ধতি মূলত কয়েকভাবে করা যায়। যার মধ্যে বিষয়ের সাথে বিষয়ের, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, একজনের সাথে অন্যজনের ইত্যাদি। যেমন গবেষণার বিষয় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান। ফলে রবীন্দ্রনাথের গানগুলোর মধ্যেই তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়। আবার রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর সমকালীন পূর্ব অথবা পরবর্তী স্বদেশ পর্যায়ের পর্যায়ভুক্ত গান এ বিশ্লেষণে আনা যেতে পারে। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের গান যেহেতু বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি সেই জন্য এ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে একই উদ্দেশ্যে যাঁরা সংগীত রচনা করেছেন তাঁদের সাথে তুলনা করবো। পঞ্চকবিদের সাথে তৎকালীন শ্রেষ্ট কবিদের সৃষ্টি এ অধ্যায়ের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯ জুলাই ১৮৬৩ - ১৭ মে ১৯১৩)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯ জুলাই ১৮৬৩ - ১৭ মে ১৯১৩) ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি কবি, নাট্যকার ও সংগীতস্রষ্টা। তাঁর নাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হলেও ডি. এল রায় নামেই সর্বজন পরিচিত। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় ৫০০টি যা দ্বিজেন্দ্রগীতি নামে পরিচিত। 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা', 'বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ' ইত্যাদি গানগুলো সবচেয়ে জনপ্রিয়। "দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান তিনটি ধারায় বিকশিত হয়েছে। যথা– প্রেমের গান, স্বদেশী গান ও হাসির গান। এর মধ্যে তাঁর প্রেমের গান সবচেয়ে আন্তরিক সৃজন, স্বদেশী গান সবচেয়ে জনপ্রিয়, হাসির গান সবচেয়ে মৌলিক ও অভিনব।।"[১] তবে তাঁর দেশীয় সংগীত ছিল স্বদেশী আন্দোলনের ভাবাস্ত্র। গবেষকগণ মনে করেন–

> দ্বিজেন্দ্রলালের দেশীয় সঙ্গীতের ভিত যথেষ্টই দৃঢ় ছিল। ফলে বিলেত বাসকালে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতে দক্ষতা লাভ করেন। এখানে তিনি Lyrics India নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের কম্পোজিশনে বিলিতি সুরের সংযোগ একই সঙ্গে জনপ্রিয় ও বিতর্কযোগ্য হয়ে ওঠে। তখন তার পক্ষে লিখিত সমর্থন জানান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অবশ্য জীবনের শেষ দিকে সাহিত্য বিষয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর মধ্যে মতানৈক্য ঘটেছিল।[২]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের বৈশিষ্ট্য

১. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা– প্রেম, স্বদেশী ও হাসির গান।

২. অনেক গবেষক মনে করেন ডি.এল রায়ের গানের কথা ও সুর প্রয়োগ বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের মতো গুরুগম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু ডি. এল রায় যার্থাথই মনে করেন 'কাব্য হবে স্পষ্টভাষী, অর্থমূল্যই তার শেষ কথা। যা বোঝা যায় না তাতে আমি নেই। গবেষণায় দেখা গেছে ডি. এল রায়ের গান অনেকটা চঞ্চল।

৩. কথা ও সুরের যূগল সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

৪. ডি. এল রায়ের গানে আইরিশ, ইংরেজি সুর অর্থাৎ অন্যান্য ধারার মতো দেশাত্মবোধক গানেও বিদেশী সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৫. তাঁর স্বদেশী গানে জাতীয়তাবাদের নব্য প্রেরণা পরিস্ফুট হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী সংগীতের মধ্যে উন্মাদনা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সংগীতগুলো কাব্যমূল্যে ও সুরশৈলীতে অনন্য অসাধারণ। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী সংগীতগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতের ন্যায় ভাব ও রূপের শৈল্পীক সমন্বয় ঘটেছে। সংগীতগুলোর মধ্যে দেশকাল অতিক্রমকারী ভাবস্বপ্নের ও ভৌগোলিক রূপ উজ্জ্বল হয়ে বর্ণিত হতে দেখা যায়।

আমাদের বক্ষ্যমান গবেষণার এ পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথের সাথে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের রচিত বিখ্যাত 'আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালবাসি', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে/সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে'॥ ইত্যাদি গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভূমিকে মাতৃরূপে মর্যাদা দিয়েছেন। অপরদিকে "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ/ উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব" গানের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল দেশমাতৃকার রূপকেই বর্ণনা করেছেন।

ডি. এল রায়ের বিখ্যাত গানের মধ্যে অন্যতম একটি গান

বঙ্গ আমার! জননী আমার।
ধাত্রী আমার! আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন,
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ! [৩]

এ গানে দেশমাতৃকার পরাধীন রূপচিত্র চিত্রিত হয়েছে। সেই সাথে দেশমাতৃকাকে নানা রকম সাহস জুগিয়েছেন।

কীসের শোক করিস ভাই
আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,
আবার তোরা মানুষ হ ॥ [৪]

ডি. এল রায়ের এ স্বদেশী গানে মিলনের সুর লক্ষ্য করা যায়। যা রবীন্দ্রনাথের বেশকিছু গানে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্লেষিত ডি. এল রায়ের এ গানে প্রতিটি স্তবকে স্বদেশপ্রেমের নামে অত্যাচার অবিচারের বিরূদ্ধে প্রতিবাদের সুর ভেসে আসে।

সুরশৈলীর দিক থেকে ডি. এল রায়ের গানে তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়।

যেমন

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা;
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে-দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।[৫]

নিজস্ব স্বরলিপি

॥	র্সা	র্সা	-া	।	র্সা	-া	র্সা	।	র্রা	র্সা	-া	।	ণা	আ	ণা	।
	এ	ম	ন		দে	শ	টি		কো	থা	ও		খুঁ	জে	০	

॥ পধা ধা -পা । ধা পধা ণা । ধা ণা -া । -া র্রা র্সা ।

পা বে ০ না কো ০ তু মি ০ - গ কল

এর প্রকৃষ্ট্য উদাহরণ। গানের সুরের চলনে পাশ্চাত্যের সুরের একটা লাফিয়ে যাওয়া চলন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উল্লেখ্য, উক্ত গানে ডি. এল রায়ের গানের সুরে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও ভারতীয় সংগীতের রাগ-রাগীনির কথা ভুলে যান নি।

রজনীকান্ত সেন (২৬ জুলাই, ১৮৬৫ - ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০)

রজনীকান্ত সেন (২৬ জুলাই, ১৮৬৫ - ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০) বাংলা সংগীতাঙ্গনে একজন স্বার্থক সংগীতজ্ঞ, গীতিকার, সুরকার সর্বোপরি সাধক। তাঁর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উপজীব্য বিষয় ঈশ্বরের আরাধনায় ভক্তিমূলক ও দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধ বা স্বদেশ প্রেম। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত স্বদেশী গান ছিল অসীম প্রেরণার উৎসস্থল। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই/ দীন দুখিনি মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।" সেই সময় এ গানটি তাঁকে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তুলেছিলো ।

> এই একটি গান রচনার ফলে রাজশাহীর পল্লী-কবি রজনীকান্ত সমগ্র বঙ্গের জাতীয় কবি কান্তকবি রজনীকান্ত হয়ে উঠলেন ও জনসমক্ষে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলেন। প্রায়শঃই তার গানগুলোকে কান্তগীতি নামে অভিহিত করা হতো।এ গানটি রচনার ফলে পুরো বাংলায় অদ্ভুত গণ-আন্দোলন ও নবজাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি করে। গানের কথা, সুর ও মাহাত্ম্য বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করায় রজনীকান্ত ও ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গও গানটিকে উপজীব্য করে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপণায় অগ্রসর হতে থাকেন। ভারতীয় বিপ্লবী নেতারাও পরবর্তী বছরগুলোয় বেশ সোৎসাহে আন্দোলনে।[৬]

রজনীকান্তের গানের বৈশিষ্ট্য

১. রজনীকান্তের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঈশ্বর-বন্দনা।

২. স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। অতএব তাঁর গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য স্বাদেশীকতা।

৩. ঈশ্বর বন্দনার পাশাপাশি প্রার্থনা সংগীত অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪. তাঁর গানের কথায় সুরে আত্মবেদনা ও আত্মদীনতা প্রকাশ পেয়েছে।

৫. প্রেম ও প্রকৃতির ভাবের গান সৃষ্টিতে তিনি বিশেষ কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন।

৬. তাঁর গানে দুঃখ বেদনা সন্তাপকে আপন ভেবে নিয়েছেন।

৭. তাঁর গানের নিজস্ব যন্ত্রণাকে নিজ জীবনের আশীর্বাদ স্বরূপ প্রকাশ করেছেন।

৮. তাঁর সৃষ্ট গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পরমেশ্বরকে স্মরণ, সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিচল ভক্তিভাব।

৯. মানবিক প্রেমের উদ্ভাব প্রকাশ পায় তাঁর গানে।

১০. অনেক সময় গানের বাণীতে জগৎ জীবনের প্রতি বৈরাগ্য প্রকাশ পেয়েছে।

রজনীকান্তের গানের কথা ও সুর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর প্রায় সব ধরনের গানেই সহজ সুরশৈলী ও বাণীর বর্ণিল সরলতা ও বিচিত্র ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের বাণীর মধ্যে একটা পাণ্ডিত্য রয়েছে যা রজনীকান্তের গানে নেই। তাঁর বিখ্যাত গান "আমরা নেহাত গরীব আমরা নেহাত ছোট/তবু আজি সাত কোটি ভাই জেগে ওঠো ॥" এ গানে বিদেশী পণ্য বর্জনের একটা আভাস লক্ষ্য করা যায়। এ গানের দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছে "জুড়ে দে ঘরের তাঁত সাজা দোকান/ বিদেশে না যায় ভাই গোলারই ধান। যা রবীন্দ্রনাথের রচিত "আমার সোনার বাংলা গানের" শেষ চরণে 'পরের ঘরে কিনব না মাগো ভূষণ বলে গলার ফাঁসি' অনুরূপ পণ্য বর্জনের আভাস পাওয়া যায়। তাঁর রচিত "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" গানটি স্বদেশী আন্দোলনের সময় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এ গানটিও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে স্বদেশী পণ্য গ্রহণ ও বিদেশী পণ্য বর্জন নিয়ে রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তৎকালীন বাঙলায় যে মোটা কাপড় উৎপাদন হতো তা বাঙালিরা বর্জন করে বিদেশী চিকন কাপড় গ্রহণ করতেন; তাই তিনি রচনা করেন–

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের, এর বেশী আর সাধ্য নাই।
ওই মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের, অপার হে দেখতে পাই।
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই, পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ওই দুঃখী মায়ের ঘরে তোদের, সবার প্রচুর অন্ন নাই
তবু তাই বেচে কাঁচ সাবান মোজা, কিনে করলি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে, এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই!
পরের জিনিস কিনব না, যদি, মায়ের ঘরের জিনিষ পাই। [৭]

তৎকালীন সময়ে এ গানের গ্রহণযোগ্যতা ও গানের সমকালীনতার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হয়। যা পরবর্তী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কেননা এ গান তৎকালীন বাঙালির মুখে মুখে ধ্বনিত হতো। এ গানের মধ্যদিয়ে বাঙালি তার আপন মহিমা খুঁজে পেয়েছিল।

অতুলপ্রসাদ সেন (২০ অক্টোবর ১৮৭১ - ২৬ আগস্ট ১৯৩৪)

অতুলপ্রসাদ সেন (২০ অক্টোবর ১৮৭১ - ২৬ আগস্ট ১৯৩৪) বাংলা শিল্প ও সাহিত্যে এক বিস্ময়কর নাম। যাঁর মেধা ও পাণ্ডিত্যে তিনি বাংলা শিল্প, সাহিত্য বিশেষ করে সংগীতধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। উল্লেখ্য অতুলপ্রসাদ সেন একজন বিশিষ্ট সংগীতবিদও ছিলেন। তাঁর রচিত গানগুলির মূল উপজীব্য বিষয় ছিল দেশপ্রেম, ভক্তি ও প্রেম, সেই সাথে দুঃখ ও যন্ত্রণা তার গানের প্রধান অবলম্বন। তাঁর সংগীতের প্রতি প্রেম তৈরি হয় লণ্ডনের মিডল টেম্পলে ব্যারিস্টারি পড়ার সময়ে। তৎকালীন সময় তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার পাশাপাশি পাশ্চাত্য সংগীতও গভীরভাবে অবলোকন করেন। কর্মজীবনে লক্ষ্ণৌতে থাকার সুবাদে তাঁর গানে ঠুংরির প্রভাব বেশি।

অতুলপ্রসাদ সেনের গান এর বৈশিষ্ট্য

১. অতুলপ্রসাদ সেন এর গানগুলি মূলত তিন ধারায় বিভক্ত

ক. স্বদেশী সংগীত

খ. ভক্তিগীতি

গ. প্রেমের গান

২. তাঁর ব্যক্তিজীবনের বেদনা সকল ধরনের গানেই কম-বেশি প্রভাব ফেলেছে। এজন্য তাঁর অধিকাংশ গানই হয়ে উঠেছে করুণ-রস প্রধান।

৩. প্রথম দিকের গানের চেয়ে পরবর্তীতে রচিত গানের সুর-তালের ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লক্ষ্য করা যায়।

৪. অতুলপ্রসাদই প্রথম বাংলা গানে ঠুংরির চাল সংযোজন করেন। উল্লেখ্য যে, বাংলায় ঠুংরি গীতিধারার প্রথম প্রচলন করেন লক্ষ্ণৌর বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ।

৫. অতুলপ্রসাদের বিশেষত্ব এই যে, তিনি বাংলা গানের সুর- তালের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেই হিন্দুস্তানি রীতির প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন।

৬. রাগপ্রধান ঢঙ্গে বাংলা গান রচনা তাঁর থেকেই শুরু হয়।

৭. বাংলা গানের সুর-তালের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেই হিন্দুস্তানি রীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

৮. হিন্দুস্তানি লঘু খেয়াল, ঠুংরি, ও দাদরার সুষমামণ্ডিত সুরের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় ।

৯. হিন্দুস্তানি সুর সংযোজনায় বাংলা গানের কাব্যিক মর্যাদা কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করলেও একটি স্বতঃস্ফূর্ত সাঙ্গীতিকভাব তাঁর প্রায় সকল গানে পরিলক্ষিত হয়।

১০. তাঁর সুর সংগীতের মাধুর্য্য নিয়ে কথার ভাবকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ।

১১. তাঁর ঠুংরি ও দাদরা ভঙ্গির গানগুলি শৈল্পিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে।

গান. কি আর চাহিব বলো (ভৈরবী/টপ খেয়াল),

গান. ওগো নিঠুর দরদী (মিশ্র আশাবরী-দাদরা),

গান, যাব না যাব না ঘরে (ঠুংরি) ইত্যাদি।

অতুলপ্রসাদ সেন তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিমান সংগীতস্রষ্টা। তাঁর স্বদেশী সংগীত অবলোকন করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের সাথে অনেক মিল রয়েছে। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের সম্পর্ক ছিল শিক্ষক ছাত্রের ন্যায়। অতুলপ্রসাদ সেন "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা,/ অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননিজননী॥" গানটির স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন তিনি (রবীন্দ্রনাথ) আমাদের শিক্ষক। তাছাড়া কবি গুরু তাঁর "পরিশোধ" কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন স্নেহের অতুলপ্রসাদকে।

অতুলপ্রসাদের স্বদেশী গানের মধ্যে 'উঠ গো ভরতলক্ষ্মী', 'খাঁচার গান গাইবো না আর', 'মোদের গরব মোদের আশা', 'বলো বলো বলো সবে', 'দেখ মা এবার দুয়ার খুলে' এমন গানগুলো তৎকালীন সময় স্বদেশী আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠে।

অতুলপ্রসাদের সৃষ্ট প্রথম স্বদেশী সংগীত "উঠো গো ভারত-লক্ষ্মী/উঠো আদি-জগত-জন-পূজ্যা" যা বিদেশী সুরের প্রভাবে রচিত। তাঁর রচিত স্বদেশী সংগীতের সংখ্যা অল্প হলেও গানে উঠে এসেছে স্বদেশমাতৃকার বন্দনা, মধুর ভক্তিভাবে হৃদয়স্পর্শী ভাবব্যঞ্জনা। সরল সুরের সাবলীর শব্দ প্রয়োগে কয়েকটি সংগীত সার্থকতার শীর্ষে চলে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের সাথে অতুলপ্রসাদের গানের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমে বলা উত্তম রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনার ন্যায় অতুলপ্রসাদের গানেও স্বদেশচেতনা ও গভীর জীবনাদর্শের প্রকাশ ঘটেছে।

১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়ক হিসেবে তিনি যে দেশাত্মবোধক গানটি রচনা করেন, তাতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের সুর আছে:

দেখ্ মা, এবার দুয়ার খুলে ।
গলে গলে এনু মা, তোর,
হিন্দু মুসলমান দু ছেলে।
এসেছি মা, শপথ করে,
ঘরের বিবাদ মিটবে ঘরে ;
যাব না আর পরের কাছে
ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হলে । [৮]

গানটি হয়তো বা রবীন্দ্রনাথ রচিত যা ডিসেম্বর ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" প্রভাবেই রচিত। তবে দু'টি সুরই রামপ্রসাদী।

দেশবাসীকে মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে সে সময় রচিত হয়েছে বহুসংখ্যক গান। অতুলপ্রসাদ সেনও সেই ভাবাদর্শে রচনা করেন। তার মধ্যে অন্যতম–

কত কাল রবে নিজ যশ-বিভব-অন্বেষণে ?
দু দিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে ?
ঘরেতে ধন কর পুজি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি ?
দীনের দুঃখ করো হে মোচন, দীনের অভাব নাই এ দেশে। [৯]

রবীন্দ্রনাথের রচিত ' অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানটি প্রথমে ভারতলক্ষ্মী শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বোধ করি রবীন্দ্রনাথের ভারতলক্ষ্মী গানে অনুপ্রাণিত হয়েই অতুলপ্রসাদ রচনা করেছিলেন "উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী" আবার "আমার সোনার বাংলা' গানটির অনুপ্রারণায় রচনা করেন "মা তোর শীতল কোলে" গানটি। তবে এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে অতুলপ্রসাদ ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভাধর একজন সংগীত সাধক। বিশ্বকবির বলয়ে আবদ্ধ থাকলেও তাঁর সৃজনশীলতায় ছিলেন স্বাতন্ত্র।

কাজী নজরুল ইসলাম (২৪ মে ১৮৯৯-২৯ আগস্ট ১৯৭৬)

কাজী নজরুল ইসলাম (২৪ মে ৮৯৯ ২৯ আগস্ট ১৯৭৬; ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)। মূলত একজন কবি হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রধান সংগীতকারদের মধ্যে অন্যতম। মাত্র ২৩ বছরের শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি সাধনায় তুলনারহিত সৃষ্টিভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন। নজরুল ১৯২২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রাজদ্রোহীতার অপরাধে কারাবন্দী হয়েছিলে। নজরুলের সৃষ্টি সাধনার এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সংগীত। উল্লেখ্য তিনি বাংলা সংগীত অঙ্গনে সর্বাধিক সংগীতের স্রষ্টা।

১. নজরুলের গানে উপমার ও অলঙ্কারের ব্যবহারে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

২. তাঁর গানে ভাব,বাণী ও সুরের ত্রিবেণী সম্মিলন ঘটেছে ।

৩. গানের সুরে শাস্ত্রীয় রাগের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।

৪. প্রেম-বিরহ, মনুষত্ব হতাশা বিশাদময় জীবন চিত্রিত হয়েছে তাঁর গানে।

৫. বিদ্রোহ ও স্বদেশীকতা তাঁর গানের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ড. করুণাময় গোস্বামী নজরুলের দেশাত্মবোধক গানগুলো পর্যালোচনা করে ৭টি ভাগে ভাগ করেছেন–

১. দেশ বন্দনামূলক গান

২. পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

৩. শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার গান

৪. নারী জাগরণমূলক গান

৫. মুসলিম জাগরণমূলক গান

৬. দেশাত্মবোধক ব্যাঙ্গগীতি

৭. সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার গান [১০]

শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয় রে আয়
গিরি-দরী, বনে-মাঠে, প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়।।
ধানের ক্ষেতে, বনের ফাঁকে, দেখে যা মোর কালো মাকে
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ বাজায়।।
ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটি
বিজনমাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা, খড়, মাটি
কালো মেঘের ঝারি নিয়ে করুণা-বারি ছিটায় ॥

॥ {পা -া পা । ধা ণা -ধা । পা -ধা পা । মা গা -মা ।
শ্যা ম্ লা ব র ণ্ বা ঙ্ লা মা যে র্

। পা -া পা । না না -া । না -া র্সা । (ণা -ধা -পা । নর্সা -া -া ।
রূপ্ ০ দে খে যা ০ আয় ০ রে আ ০ য় আ০ য় ০

১১

নজরুলের এ গানটিতে স্বদেশের রূপ বর্ণিত হয়েছে। চমৎকার সুরশৈলীতে গানটির মধ্যদিয়ে কবি দেশবন্দনা করে গেছেন। সুরশৈলীর দিক থেকে গানটি মিশ্র খাম্বাজ রাগে বাঁধা হয়েছে। গানটির সুর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে শুরুর দিকে অর্থাৎ স্থায়ীতে খাম্বাজ রাগের চলন পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। গানটির আরোহীতে শুদ্ধ নিখাদ আর অবরোহীতে কোমল নিখাদ সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে, যা খাম্বাজ রাগরূপের কথাই মনে করিয়ে দেয় । বলে রাখা দরকার নজরুল তাঁর গানে বাণী ও সুরের চমৎকতার সমঝোতা করে গেছেন।

। র্সা র্সা -া । র্সা র্সা -না । না পা -ধা । ক্ষা ক্ষা গা ।
সাঁ ঝে র্ বা রা ন্ দা তে ০ দাঁ ড়া য়্

॥ গা -া ক্ষা । গক্ষা -ধা ক্ষা । পা -া ঋা । সা -া --া ।
টি প্ প রে০ ০ সনা আ ০ তা রা ০ র্

১২

গানটিতে বাণী ও সুরের যোগসূত্র তালাশ করলে দেখা যায় যে উক্ত গানে যখন " সাঁঝের বারান্দাতে দাঁড়ায় টিপ পরে সন্ধ্যা তারায়" কথাটির সময় রাগরূপ পরিবর্তন করে সন্ধ্যা রাগের গাঁথুনিতে গানটি বির্নিমাণ করেছেন।

ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি
এই দেশেরই মাটি-জলে
এই দেশেরই ফুলে-ফলে... [১৩]

নজরুল সংগীতের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গানের মধ্য অন্যতম একটি গান। গানটির অন্তরার অংশে স্পষ্টতই বাউল আমেজ লক্ষ্য করা যায়। ফলে বলতে পারি নজরুল বাউল ও কীর্তন অঙ্গের মিশ্রণে স্বদেশের মাতৃরূপের চিত্র অঙ্কন করেছেন এ গানে। দাদরা তালে নিবদ্ধ গানটির রাগ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এটিও খাম্বাজ রাগে বাঁধা হয়েছে। সুরের চলন বাণীকে আরো মাধুর্য্য দান করেছে ।

কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী
কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ- বেদী [১৪]

গানটি মূলত নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার বহিঃপ্রকাশ। গানটি নজরুলের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফসল। ফলে গানটি একটু জনযোদ্ধার মার্চ করার মাধ্যমে রৌদ্র-রস ফুটে উঠছে। দাদরা (দ্রুত) তালে নিবদ্ধ গানটিতে শেষের দিকে একটি জায়গায় কোমল নিখাদের ব্যবহার ছাড়া সবটা জুড়ে শুদ্ধ স্বরের ব্যবহার করেছেন।

ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার গাইব কি আর এমন গান!
সেদিন দুয়ার ভেঙে আসবে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান ॥
তোরা স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর পাস রে মান।
সেই কলজে চুঁয়ে গলছে রক্ত দলছে পায়ে ডলছে কান ॥ [১৫]

খাম্বাজ রাগে দাদরা (দ্রুত) তালে নিবন্ধ গানটিতে নজরুরলের অসাম্প্রদায়িক ভাবচেতনা সাথে আত্মপ্রত্যয়ের উদ্দীপ্ততা ফুটে উঠেছে। আমরা জানি যে খাম্বাজ রাগের মীড়ের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় কিন্তু এ গানে মীড়ের ব্যবহার তেমন লক্ষ্য করা যায় না।

সেকালের আরো বেশকিছু কবি গীতকারের রচনায় স্বাদেশীকতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। তাঁর রচিত "মাগো যায় যেন জীবন চলে/শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে/ বন্দে মতরম্' বলে" গানটি মূলত বাউল সুরে বাঁধা হয়েছে। তাঁর অরেকটি গানে এরূপ বাউল সুরের আভাস পাওয়া যায়। "ভাই সব দেখ চেয়ে, বাজার ছেয়ে/ আসছে মাল বিদেশ হ'তে/ আমাদের বেচাকেনা, পাওনা দেনা/ অভাব-মোচন পরের হাতে. . .।" গানটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। গানটির বাণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বক্তব্য উদ্ভাসিত হয়েছে। যা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিরীতির সাথে সুর ও বাণীর মিল লক্ষ্য করা যায়।

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন-এর গানেও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ভারতমাতার বন্দনা লক্ষ্যণীয়। তাঁর বেশির ভাগ স্বদেশী গানেই উদ্দীপনাময় ভাবের চেয়ে ভারতমাতার বন্দনার সুর লক্ষ্য করা যায়। যেমন "ভারত জননী,মলিন বদনী/অশ্রুজল মুখে শোক শেল বুকে" আবার "জননী জন্মভূমি স্বর্গ তুমি মহীতলে", "পুঁজি পা দুখানি আজি মোরা অশ্রুজলে"। ইত্যাদি। অপরদিকে শীতলাকান্তের গানে যেমন বঞ্চিত ভারতবাসীর অধিকারের বাণী ফুটে উঠে আবার উপেন্দ্রনাথ দাসের গানে ভারতমাতার রূপ চিত্রিত হয়েছে। যা রবীন্দ্রনাথের গানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

এ অধ্যায়ের গবেষণার প্রেক্ষিতে বলতে পারি যে, হিন্দুমেলা থেকে নজরুল পর্যন্ত যে সব স্বদেশী গান রচনা হয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগ গানেই লোকসুরের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। হিন্দুমেলা থেকে শুরু করে পঞ্চকবিসহ তৎকালীন প্রায় সব গীতিকার, সুরকারের বাণী ও সুর বিবেচনা করলে রবীন্দ্র প্রভাব আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ঐ সময়ের গীতিকবিগণ স্বদেশী আন্দোলনের জন্যে বাণীকেই মূখ্য করে দেখলেও সুরের ক্ষেত্রে কীর্তন, বাউল, সারি প্রভৃতি সুরকে গুরুত্ব দিয়েছেন। রাগ-রাগিনীর ব্যবহার যে একেবারেই করেন নি তা নয় তবে তা গানের বিষয়বস্তু অনুযায়ী স্বল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *আধুনিক বাংলা গান*, প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৯৪, পৃষ্ঠা, ১৭১-১৭২।

২. যাহেদ করিম সম্পাদিত *নির্বাচিত জীবনী* ১*ম খণ্ড*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা; ২য় প্রকাশ আগস্ট ২০১০, পৃষ্ঠা, ৪৭-৪৯।

৩. সংকলন ও সম্পা. সুধীর চক্রবর্তী, *দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮, পৃষ্ঠা, ১৫৩
৪. তদেব পৃষ্ঠা, ১৪৯
৫. তদেব পৃষ্ঠা, ১৬১
৬. https://bn.wikipedia.org/wiki/রজনীকান্ত সেন/ভিজিট ০২-১১-২০২১।
৭. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *ভাষা ও দেশেল গান*, স্বরলিপি সহ অনুপম প্রকাশনী ২০০৫ পৃষ্ঠা, ৭
৮. অতুলপ্রসাদ সেন, *গীতিগুঞ্জ*, সাধারন ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৩১ পৃষ্ঠা, ৭৬
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৭
১০. করুণায়ম গোস্বামী, *নজরুল গীত প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি,১৯৯৬ পৃষ্ঠা, ১২৫
১১. *নজরুল-সংগীত স্বরলিপি*, *তৃতীয় খণ্ড*, স্বরলিপিকার ঃ সুধীন দাস, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা ১৯৮৮ পৃষ্ঠা, ১০০
১২. তদেব পৃষ্ঠা, ১০৪
১৩. *নজরুল-সংগীত স্বরলিপি*, *চৌত্রিশতম খণ্ড*, স্বরলিপিকার ঃ সুধীন দাস, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা ২০১২ পৃষ্ঠা, ৪
১৪. *নজরুল-সংগীত স্বরলিপি*, *বিংশ খণ্ড*, স্বরলিপিকার ঃ রশিদুন্ নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা ২০০০ পৃষ্ঠা, ৪২
১৫. *নজরুল-সংগীত স্বরলিপি*, *ষোড়শ খণ্ড*, স্বরলিপিকার ঃ রশিদুন্ নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা ২০১২ পৃষ্ঠা, ৬৯

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত সাধনা ও সৃষ্টি সবচেয়ে বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। তৎকালীন সময়ে তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গান রচনা ইতিহাসের একটি প্রধান অধ্যায়রূপে বিবেচ্য। তবে আমার জানি যে এ আন্দোলনের জোয়ার শুরু হয়েছিলো হিন্দুমেলা থেকে। আর একথা উল্লেখ করা জরুরী যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে গান রচনার সংখ্যা ছিল একদম কম। ১৯০৫ সালের আগে রচিত স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলোর মধ্যে 'অয়ি ভূবনমনোমোহিনী', (পৌষ-১৩০৩,ডিসেম্বর ১৮৯৬) 'আজি এ ভারত লজ্জিত হে', (ফাল্গুন ১৩০৬ ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৮৯০) 'জননীর দ্বারে আজি' (১৯০৩-০৪) ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। তবে উন্মাদনা সৃষ্টকারী গানগুলোর মধ্যে "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে" গানটি স্বদেশী আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিলো।

গবেষণার মূল বিষয়বস্তু বাণী ও সুর। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখতে পাবো যে হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত স্বদেশ পর্যারের গানের সুরে রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগনীর ব্যবহার করেছিলন খুব সচেতনভাবে। বাণীর দিক থেকে সংস্কৃত শব্দ প্রযোগে তাঁর পাণ্ডিত্য বেশ লক্ষ্যণীয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে কেবলমাত্র কীর্তন সুরে "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" ও ডিসেম্বর ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত রাম প্রসাদী সুরের "মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" আবহমান বাঙলার নিজের সুরে বাঁধা হয়েছে। অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের সময়ে তাঁর বেশিরভাগ গানই ছিল বাউল, কীর্তন, সারি অঙ্গের। এ গবেষণায় দেখা গেছে এ সব গানগুলোতেও বাণীর ভাব রক্ষায় মাঝে মধ্যে রাগ-রাগীনির প্রয়োগ করেছেন বটে কিন্তু সেক্ষেত্রে লোকসুরের তেমন বিকৃতি ঘটে নি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি স্বদেশ পর্যায়ের গান রচনা করছেন। আন্দোলনের পর এ ধারা অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং রবীন্দ্রনাথও গান লেখার ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। শেষ বয়সে যে কয়টি গান তিনি রচনা করেছেন তার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের প্রযোগ বেশি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গানের যে ভাবটি সবচেয়ে সুন্দরভাবে ফুটে উঠে তা হলো নির্ভীকতা, আত্মশক্তি, পরাধীনতার বলয় থেকে মুক্তি। স্বদেশ সাধনার সামগ্রীক গীতসৃষ্টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর সৃষ্ট বাণী ও সুরের বিচেনায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ স্বদেশী গানের মধ্যে অন্যতম।

পরিশিষ্ট

গান-১

গান : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি

সুর: বাউল

তাল: দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ৭ আগষ্ট ১৯০৫

মূল গান: আমি কোথায় পাবো তারে/ আমার মনের মানুষ যে রে।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে

তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,

সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,

তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,

মরি হায়, হায় রে

ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি॥

ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে

দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে।

ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,

মরি হায়, হায় রে

আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি॥

গান-২

গান : ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।

তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥

সুরঃ বাউল (রাগ পিলু)

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সালঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৫

মূল গানঃ আমার সোনার গৌর কেনে

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা

তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা ॥

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে

তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে

তোমার ওই শ্যামলবরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা ॥

ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে

তোমার 'পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে

তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে

তুমি শীতল জলে জুড়াইলে

তুমি যে সকল-সহা, সকল-বহা, মাতার মাতা ॥

অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা

ও মা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা

তবু জানিনে যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা

আমার জনম গেল বৃথা কাজে

আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে

জনম গেল বৃথা কাজে

আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে

তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে, শক্তিদাতা ॥

গান-৩

গান : যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।

একল চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে॥

সুর: বাউল

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গান: হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে, আমার একলা নিতাই।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়--
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ॥
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়--
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে ॥
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে--
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে ॥

গান: ৪

গান: তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,

তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।

সুর: বাউল

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গান: নেই

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না॥
আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই বলেই কি রইবি থেমে
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্বলবে না॥
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী
হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গলবে না।
বদ্ধ দুয়ার দেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
হয়তো দুয়ার টলবে না॥

গান-৫

গান: এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী ॥

ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে, তাই, ডাক দে আজি–

সুর: সারি

তাল: কাহারবা

স্বরলিপিকার: শৈলজারঞ্জন মজুমদার

প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গান: মন মাঝি সামাল সামাল, ডুবলো তরী, ভব নদীর তুফান ভারি

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী॥
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে, ভাই, ডাক দে আজি
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল সব দড়াদড়ি॥
দিনে দিনে বাড়ল দেনা, ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা
হাতে নাই রে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন করে
ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি॥

গান: ৬

গান: নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।

যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।

সুর: বাউল (রাগ বিভাস)

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গান: নেই

নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন, হবেই হবে ॥
পাষাণসমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে ॥
সময় হল, সময় হল-- যে যার আপন বোঝা তোলো রে--
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে দেখবি সবাই আসবে সেজে--
এক সাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে ॥

গান: ৭

গান: আমি ভয় করবো না ভয় করবো না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ॥

সুর: বাউল (রাগ বিভাস)

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গান: নেই

আমি ভয় করব না ভয় করব না।

দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥

তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে

তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না॥

শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে

সহজ পথে চলব ভেবে পড়ব না, পাঁকের পরে পড়ব না॥

ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে

বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না॥

গান-৮

গান: আপনি অবশ হলি, তব বল দিবি তুই কারে?

উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে ॥

সুর: মিশ্র রামকেলি

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গান: নেই

আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?

উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে॥

করিস নে লাজ, করিস নে ভয়, আপনাকে তুই করে নে জয়

সবাই তখন সাড়া দেবে ডাক দিবি তুই যারে॥

বাহির যদি হলি পথে ফিরিস নে আর কোনোমতে,

থেকে থেকে পিছন-পানে চাস নে বারে বারে।

নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে, ভয় শুধু তোর নিজের মনে

অভয়চরণ শরণ করে বাহির হয়ে যা রে॥

গান - ৯

গান : আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে

ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে তাই ক'দিন থাকে?

সুর: রামপ্রসাদী

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: কাঙালীচরণ সেন

প্রকাশ সাল: ডিসেম্বর ১৮৮৬

মূল গান: নেই

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে? ॥

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় বলে ঐ ডেকেছে কে,

সেই গভীর স্বরে উদাস করে আর কে কারে ধরে রাখে? ॥

যেথায় থাকি যে যেখানে বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,

সেই প্রাণের টানে টেনে আনে সেই প্রাণের বেদন জানে না কে?।

মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে

সেই নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে॥

কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে

আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মাকে॥

গান ১০

গান: আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ?

সুর: ইমন-ভূপালী (মিশ্র সুর)

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: অনাদি কুমার দস্তিদার

প্রকাশ সাল: অরূপ রতন নাটকের গান (১৩২৬ বাংলা)

মূল গান: নেই

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।
আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।
রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো ক'রে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে---
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?
আমরা চলব আপন মতে, শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।

গান: ১১

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান

সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।

সুর: ইমন কাল্যাণ

তাল : দাদারা

স্বরলিপিকার: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ সাল: ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৯২৯-১৯৩০

মূল গান: নেই

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,

সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।

মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।

দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,

নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।

মুক্ত করো ভয়, নিজের পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।

ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান

নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।

মুক্ত করো ভয়, দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

গান: ১২

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার–

জানি জানি তোর বন্ধনডোর ছিঁড়ে বারে বার ॥

সুর: ভৈরবী

তাল : কাহারবা

স্বরলিপিকার: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ সাল: ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬

মূল গান: নেই

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার

জানি জানি তোর বন্ধনডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বার॥

খনে খনে তুই হারায়ে আপনা সুপ্তিনিশীথ করিস যাপনা

বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার॥

স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান, আহ্বান লোকালয়ে

চিরদিন তুই গাহিবি যে গান সুখে দুখে লাজে ভয়ে।

ফুলপল্লব নদীনির্ঝর সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর

ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে আলোক অন্ধকার॥

গান: ১৩

আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।

তোমারে করি নমস্কার।

সুর: ভৈরবী

তাল : একতাল

স্বরলিপিকার: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশ সাল: ০৭ অক্টোবর ১৯০৫

মূল গান: নেই

আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।

তোমারে করি নমস্কার।

এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর

তোমারে করি নমস্কার॥

আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি

ওগো কর্ণধার।

এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার

তোমারে করি নমস্কার॥

এখন রইল যারা আপন ঘরে চাব না পথ তাদের তরে

ওগো কর্ণধার।

যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কে বা কার

তোমারে করি নমস্কার।

মোদের কেবা আপন, কে বা অপর, কোথায় বাহির, কোথা বা ঘর

ওগো কর্ণধার।

চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার

তোমারে করি নমস্কার॥

আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরো গো হাল

ওগো কর্ণধার।

মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী বা তার

তোমারে করি নমস্কার।

আমরা সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে

ওগো কর্ণধার।

কেবল তুমিই আছ আমরা আছি এই জেনেছি সার

তোমারে করি নমস্কার॥

গান: ১৪

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ

সুর: ইমন

তাল : কাহারবা

স্বরলিপিকার: দিন্দ্রেনাথ ঠাকুর

প্রকাশ সাল: ২৮ ডিসেম্বর ১৯১১

মূল গান: নেই

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ

বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ

তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,

গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥
রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে
গাহে বিহঙ্গম, পূণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।

তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে

তব চরণে নত মাথা।

জয় জয় জয় হে জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

গান: ১৫

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

সুর: শঙ্করা

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ভীমরাও শাস্ত্রী

প্রকাশ সাল: ২রা জুলাই ১৯১০

মূল গান: নেই

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে

উদার ছন্দে, পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।

ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,

হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা

দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন

শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।

পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।

এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।

এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা

সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে

আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

গান-১৬

গান: দেশ দেশ নন্দিত কবি মন্দ্রিত তব ভেরী

আসিল যত বীরবৃন্দ আসল তব ঘেরি।

সুর: মিশ্র কেদারা

তাল : একতাল

স্বরলিপিকার: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ সাল: আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯১৭

মূল গান: নেই

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

বিঘ্নবিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যুগহন পার হইল, টুটিল মোহকারা।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
নিশ্চল নিবীর্যবাহু কর্মকীর্তিহীনে
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

নূতনযুগসূর্য উঠিল, ছুটিল তিমিররাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
গতগৌরব, হৃত-আসন, নতমস্তক লাজে
গ্লানি তার মোচন কর নরসমাজমাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?

দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসারুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটিমৌনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরমাঝে
বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনিপাতে।
ছায়াভয়চকিতমূঢ় করহ পরিত্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

গান-১৭

মাতৃমন্দির-পূণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জল আজ হে
বর- পুত্রসঙ্গ বিরাজ' হে

সুর: ইমন কল্যাণ

তাল : তেওড়া

স্বরলিপিকার: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ সাল: ৩০ নভেম্বর ১৯১৭

মূল গান: নেই

মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে

বর -পুত্রসঙ্ঘ বিরাজ হে।

শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে।

ঘন তিমিররাত্রির চির প্রতীক্ষা

পূর্ণ কর, লহ জ্যোতিদীক্ষা,

যাত্রীদল সব সাজ হে।

শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে।

বল জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,

জয় তপস্বিরাজ হে।

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে।

এস বজ্রমহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে,

সকল সাধক এস হে, ধন্য কর এ দেশ হে।

সকল যোগী, সকল ত্যাগী, এস দুঃসহদুঃখভাগী

এস দুর্জয়শক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।

এস জ্ঞানী, এস কর্মী নাশ ভারতলাজ হে।

এস মঙ্গল, এস গৌরব,

এস অক্ষয়পুণ্যসৌরভ,

এস তেজঃসূর্য উজ্জ্বল কীর্তি-অম্বর মাঝ হে

বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয় রাজ হে।

শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে।

জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,

জয় তপস্বিরাজ হে।

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে॥

গান: ১৮

গান: আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে

সুর: বেহাগ

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: এপ্রিল-মে ১৮৮৭

মূল গান: নেই

আগে চল্, আগে চল ভাই!

পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,

বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই!

আগে চল্, আগে চল ভাই॥

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,

দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়

সময় সময় করে পাঁজি পুঁথি ধরে

সময় কোথা পাবি বল ভাই!

আগে চল্, আগে চল ভাই॥

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও

নিয়ে যাও সাথে করে

কেহ নাহি আসে, একা চলে যাও

মহত্ত্বের পথ ধরে।

পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,

ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন

সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন,

মিছে নয়নের জল ভাই!

আগে চল্, আগে চল ভাই॥

চিরদিন আছি ভিখারির বেশে

জগতের পথপাশে

যারা চলে যায় কৃপাচোখে চায়,

পদধুলা উড়ে আসে।

ধুলিশয্যা ছেড়ে ওঠো ওঠো সবে

মানবের সাথে যোগ দিতে হবে

তা যদি না পারো চেয়ে দেখো তবে

ঐ আছে রসাতল ভাই!

আগে চল্, আগে চল ভাই॥

গান: ১৯

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।

কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া

সুর: হাম্বির

তাল : তেওড়া,দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৮৯৩

মূল গান: নেই

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।

কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া,

বলো উঠ উঠ সঘনে গভীরনিদ্রাগমনে॥

হেরো তিমিররজনী যায় ঐ, হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী

নব আনন্দে, নব জীবনে,

ফুল- কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে॥

হেরো আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল-পথে,

কিরণকিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণরথে

চলো যাই কাজে মানবসমাজে, চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে

থেকো না অলস শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে॥

যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস কুহক মোহ যায়।

ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপনপ্রায়।

ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ, আরম্ভ করো জীবনের কাজ

সরল সবল আনন্দমনে, অমল অটল জীবনে॥

গান: ২০

বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল–

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান

সুর: কীর্তন

তাল : একতাল

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: অক্টোবর ১৯০৫

মূল গান: নেই

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান॥

বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ

পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান॥

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান॥

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন

এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান॥

গান-২১

গান: আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।

সুর: বাউল (বিভাস)

তাল : একতাল

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গান: নেই

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
যখন অনাদরে চাই নি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা

আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ঐ চরণের দীপ্তিরাশি!
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

গান-২২

গান: আমায় বলো না গাহিতে বলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা?

সুর: কাফি

তাল : একতাল

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ১৭ নভেম্বর ১৮৮৬

মূল গান: নেই

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা?।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,

এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরমবেদনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা?।
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি
মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে, মিছে কাজে নিশিযাপনা!
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা?
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা?।

গান-২৩

গান: অয়ি ভূবনমনোমোহিনী, মা
অয়ি নির্মলসুর্যকরোজ্জল ধরণী জনকজননিজননী ॥

সুর: ভৈরবী

তাল : কাহারবা

স্বরলিপিকার: সরলাদেবী

প্রকাশ সাল: ডিসেম্বর ১৮৯৬

মূল গান: নেই

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননিজননী॥
নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল, অনিলবিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল, শুভ্রতুষারকিরীটিনী॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী॥

গান-২৪

গান: সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে

সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালবেসে ॥

সুর: ভৈরবী (টপ্পা অঙ্গের গান)

তাল : একতাল

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: অক্টোবর ১৯০৫

মূল গান: নেই

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে॥
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে॥

গান-২৫

গান: যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!

আমি তোমায় চরণ–

সুর: বাউল

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গান: চিরদিন এমনি ভাবে (ও মন) অসার মায়ায় ভুলে রবে।

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
আমি তোমার চরণ
মা গো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা॥
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতনরাশি
আমি জানি গো তার মূল্য জানি, পরের আদর কাড়ব না মা॥
মানের আশে দেশবিদেশে যে মরে সে মরুক ঘুরে
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা, ভুলতে সে যে পারব না মা!।
ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়
ও মা, ভয় যে জাগে শিয়র-বাগে, কারো কাছেই হারব না মা॥

গান-২৬

গান: যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু ॥
আজকে তোরে কেমন ভেবে অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে

সুর: বাউল

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গান: আমার এই দেহ তরী।

আজকে তোরে কেমন ভেবে অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে আসবে রে তোর পিছু-পিছু॥
আজকে আপন মানের ভরে থাক সে বসে গদির পরে
কালকে প্রেমে আসবে নেমে, করবে সে তার মাথা নিচু॥

গান-২৭

গান: ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি,
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী ॥

সুর: বাউল

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গান: নেই

ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি,

দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী॥

মরিস মিথ্যে বকে ঝকে, দেখে কেবল হাসে লোকে,

নাহয় নিয়ে আপন মনের আগুন মনে মনেই জ্বললি॥

অন্তরে তোর আছে কী যে নেই রটালি নিজে নিজে,

নাহয় বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে চুপেচাপেই চললি॥

কাজ থাকে তো করগে না কাজ, লাজ থাকে তো ঘুচা গে লাজ,

ওরে, কে যে তোরে কী বলেছে নেই বা তাতে টললি॥

গান-২৮

গান- যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না।

যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা॥

সুরঃ বাউল

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকারঃ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সালঃ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গানঃ নেই

যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না।

যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা॥

যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে ভুলবি যে পথ পায়ে পায়ে,

যদি তোর হাত কাঁপে তো নিবিয়ে আলো সবারে করবি কানা॥

যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাহে মন করিস ভারী বোঝা আপন

তবে তুই সইতে কভু পারবি নে রে এ বিষম পথের টানা॥

যদি তোর আপনা হতে অকারণে সুখ সদা না জাগে মনে

তবে তুই তর্ক করে সকল কথা করিবি নানাখানা॥

গান-২৯

গান: মা কি তুই পরের দ্বারের পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?

তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে ॥

সুর: বাউল

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূলগান- নেই

মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?

তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে॥

করেছি মাথা নিচু, চলেছি যাহার পিছু

যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে

তবু কি এমনি করে ফিরব ওরে আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে?।

কিছু মোর নেই ক্ষমতা সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,

এখনো হয় নি মরণ শক্তিশেলে

আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি চরণে তোর দেব মেলে॥

নেব গো মেগে-পেতে যা আছে তোর ঘরেতে,

দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে

আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ, সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে॥

গান-৩০

গান: ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।

এবার কঠিন হয়ে থাক্-না ওরে, বক্ষোদুয়ার আঁটি–

সুর: বাউল

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গান: নেই

ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।

এবার কঠিন হয়ে থাক্-না ওরে, বক্ষোদুয়ার আঁটি

জোরে বক্ষোদুয়ার আঁটি॥

পরানটাকে গলিয়ে ফেলে দিস নে, রে ভাই, পথে ঢেলে

মিথ্যে অকাজে

ওরে নিয়ে তারে চলবি পারে কতই বাধা কাটি,

পথের কতই বাধা কাটি॥

দেখলে ও তোর জলের ধারা ঘরে পরে হাসবে যারা

তারা চার দিকে

তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস, যায় না কি বুক ফাটি,

লাজে যায় না কি বুক ফাটি?।

দিনের বেলা জগত-মাঝে সবাই যখন চলছে কাজে আপন গরবে

তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে করিস ঘাঁটাঘাঁটি

কেবল করিস ঘাঁটাঘাঁটি॥

গান-৩১

গান: ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে– ওরে ভাই,

বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস নে– ওরে ভাই ॥

সুর: বাউল (স্বরলিপি নাই)

তাল :

স্বরলিপিকার:

প্রকাশ সাল: অক্টোবর ১৯০৫

মূল গান: নেই

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে ওরে ভাই,
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস নে ওরে ভাই॥
যা তোমার আছে মনে সাধো তাই পরানপণে,
শুধু তাই দশজনারে বলিস নে ওরে ভাই॥
একই পথ আছে ওরে, চলো সেই রাস্তা ধরে,
যে আসে তারই পিছে চলিস নে ওরে ভাই!
থাক্-না আপন কাজে, যা খুশি বলুক-না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায় জ্বলিস নে ওরে ভাই॥

গান-৩২

গান: এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-স্বর্গ ॥

সুর: ইমন

তাল : কাহারবা

স্বরলিপিকার: শৈলজারঞ্জন মজুমদার

প্রকাশ সাল: অক্টোবর-নভেম্বর ১৯০৫

মূল গান: নেই

এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-স্বর্গ॥
ওরে ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুলল দুয়ার মন্দিরে যে
লগ্ন বয়ে যায় পাছে, ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য?।
এখন যার যা-কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালারপরে,

আত্মদানের উতসধারায় মঙ্গলঘট ভর্ গো।
আজ নিতেও হবে, আজ দিতেও হবে, দেরি কেন করিস তবে
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মর্‌েত হয় তো মর্ গো॥

গান-৩৩

গান: বুক বেঁধে তুই দাড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই !
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতে হাতের লক্ষী ঠেলিস নে ভাই ॥

সুর: বেহাগ

তাল : একতাল

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: সেপ্টেম্বর ১৯০৫

মূল গান: নেই

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই!
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষী ঠেলিস নে ভাই॥
একটা কিছু করে নে ঠিক, ভেসে ফেরা মরার অধিক
বারেক এ দিক বারেক ও দিক, এ খেলা আর খেলিস নে ভাই॥
মেলে কিনা মেলে রতন করতে তবু হবে যতন
না যদি হয় মনের মতন চোখের জলটা ফেলিস নে ভাই!
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিস নে আর হেলাফেলা
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা তখন আঁখি মেলিস নে ভাই॥

গান-৩৪

গান: আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,

তোমার নাম গেয়ে ফিরিবো যারে দ্বারে

সুর: ভৈরবী/কালাংড়া

তাল : একতাল

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: অক্টোবর ১৯০৫

মূল গান: নেই

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,

তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে॥

বলব জননীকে কে দিবি দান,

কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ

তোদের মা ডেকেছে কব বারে বারে॥

তোমার নামে প্রাণের সকল সুর

আপনি উঠবে বেজে সুধামধুর

মোদের হৃদয়যন্ত্রেরই তারে তারে।

বেলা গেলে শেষে তোমারই পায়ে

এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে

তোমার সন্তানেরই দান ভারে ভারে॥

গান-৩৫

গান: এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভূ, তব শুভ আর্শীবাদ

তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,

সুর: সুরট দেশ

তাল : চৌতাল

স্বরলিপিকার: কাঙ্গালী চরণ সেন

প্রকাশ সাল: ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯০৩

মূল গান: য়ে বতিঁয়া মেরে চিত।

এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ

তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,

তোমার স্থির অমর আশা॥

অনির্বাণ ধর্ম আলো সবার উর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো,

সঙ্কটে দুর্দিনে হে,

রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে॥

বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম তব নির্বিদার,

নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।

পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়

থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে॥

গান-৩৬

গান: রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে?

তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই, রবার যেটা সেটাই রবে ॥

সুর: বাউল

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশ সাল: ২৬ মার্চ ১৯০৯

মূল গান: নেই

রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার টানাটানি টিঁকবে না ভাই, রবার যেটা সেটাই রবে॥
যা খুশি তাই করতে পারো গায়ের জোরে রাখ মারো;
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে তিনি যা সন সেটাই সবে।
অনেক তোমার টাকাকড়ি, অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও, জগতটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে হয় না যেটা সেটাও হবে।

গান-৩৭

গান: জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে

থেকো না থেকো না, ওরে ভাই, মগন মিথ্যা কাজে ॥

সুর: হামবির

তাল : কাহারবা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ১৯০৩-১৯০৪

মূল গান: নেই

জননীর দ্বারে আজি ঐ শুন গো শঙ্খ বাজে।

থেকো না থেকো না, ওরে ভাই, মগন মিথ্যা কাজে॥

অর্ঘ্য ভরিয়া আনি ধরো গো পূজার থালি,

রতনপ্রদীপখানি যতনে আনো গো জ্বালি,

ভরি লয়ে দুই পাণি বহি আনো ফুলডালি,

মার আহ্বানবাণী রটাও ভুবনমাঝে॥

আজি প্রসন্ন পবনে নবীন জীবন ছুটিছে।

আজি প্রফুল্ল- কুসুমে নব সুগন্ধ উঠিছে।

আজি উজ্জ্বল ভালে তোলো উন্নত মাথা,

নবসঙ্গীততালে গাও গম্ভীর গাথা,

পরো মাল্য কপালে নবপল্লব-গাঁথা,

শুভ সুন্দর কালে সাজো সাজো নব সাজে॥

গান-৩৮

গান: আজি এ ভারত লজ্জিত হে,
হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে॥

সুর: ভূপালী

তাল : ত্রিতাল

স্বরলিপিকার:

প্রকাশ সাল: ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯০০

মূল গান: নেই

আজি এ ভারত লজ্জিত হে,
হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে॥
নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা, সত্যসাধনা
অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে সকলই ব্রহ্মবিবর্জিত হে॥
ধিক্‌কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বীপরে, ধূলিবিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে করো তারে সহসা তর্জিত হে॥
পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,
পুণ্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে হইবে পলকে সজ্জিত হে॥

গান-৩৯

গান: চলো যাই চলো যাই চলো যাই–

চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে

সুর: খাম্বাজ

তাল : কাহারবা

স্বরলিপিকার: শৈলজারঞ্জন মজুমদার

প্রকাশ সাল: ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৭

মূল গান: নেই

চলো যাই, চলো, যাই চলো, যাই
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে!
চলো মুক্তিপথে,
চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে
করো ছিন্ন, করো ছিন্ন, করো ছিন্ন
স্বপ্নকুহক করো ছিন্ন।
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ
জড়তার জর্জর বন্ধে।
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়
মুক্তির জয় বলো ভাই॥

চলো দুর্গমদূরপথযাত্রী চলো দিবারাত্রি,
করো জয়যাত্রা,
চলো বহি নির্ভয় বীর্যের বার্তা,

বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়
সত্যের জয় বলো ভাই॥

দুর করো সংশয়শঙ্কার ভার,
যাও চলি তিমিরদিগন্তের পার।
কেন যায় দিন হায় দুশ্চিন্তার দ্বন্দ্বে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।
চলো জ্যোতির্লোকে জাগ্রত চোখে

বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়
বলো নির্মল জ্যোতির জয় বলো ভাই॥
হও মৃত্যুতোরণ উত্তীর্ণ,
যাক, যাক ভেঙে যাক যাহা জীর্ণ।
চলো অভয় অমৃতময় লোকে, অজর অশোকে,
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়
অমৃতের জয় বলো ভাই॥

গান-৪০

গান: শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান।

সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।

সুর: মিশ্রমল্লার

তাল : কাহারবা

স্বরলিপিকার: শান্তিদেব ঘোষ

প্রকাশ সাল: ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৭

মূল গান: নেই

শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান।

সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।

চির- শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে

লহ সে অভিষেক ললাট পরে।

তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ

ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা,

বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা

নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান।

দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান।

চল যাত্রী, চল দিনরাত্রি

কর অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান।

জড়তাতামস হও উত্তীর্ণ,

ক্লান্তিজাল কর দীর্ণ বিদীর্ণ

দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে

মৃত্যুতরণ তীর্থে কর স্নান ॥

গান-৪১

গান: ওরে, নূতন ঘুগের ভোরে

দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে ॥

সুর: ভৈরবী

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: শৈলাজারঞ্জন মজুমদার

প্রকাশ সাল: ২৪ এপ্রিল ১৯৩৭

মূল গান: নেই

ওরে, নূতন যুগের ভোরে

দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে॥

কী রবে আর কী রবে না, কী হবে আর কী হবে না

ওরে হিসাবি,

এ সংশয়ের মাঝে কি তোর ভাবনা মিশাবি?।

যেমন করে ঝর্না নামে দুর্গম পর্বতে

নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড় অজানিতের পথে।

জাগবে ততই শক্তি যতই হানবে তোরে মানা,

অজানাকে বশ করে তুই করবি আপন জানা।

চলায় চলায় বাজবে জয়ের ভেরী

পায়ের বেগেই পথ কেটে যায়, করিস নে আর দেরি॥

গান-৪২

গান: ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো ।

একলা রাতে অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো ॥

সুর: বাউল

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: অনাদিকুমার দস্তিদার

প্রকাশ সাল: অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৩৩

মূল গান: নেই

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।

একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো॥

দুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শুরু,

বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু

পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো॥

নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি

দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই-বা দেখি।

ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,

ভাব্‌নাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া

বজ্রশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো॥

গান-৪৩

গান: ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,

মোদের ততই বাঁধন টুটবে।

সুর: বেহাগ খাম্বাজ

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ০৮ অক্টোবর ১৯০৫

মূল গান: নেই

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,

মোদের ততই বাঁধন টুটবে।

ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,

ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥

আজকে যে তোর কাজ করা চাই, স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই

এখন ওরা যতই গর্জাবে, ভাই তন্দ্রা ততই ছুটবে,

মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে॥

ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,

ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে।

তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎ-প্রভু

ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে,

ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে॥

গান-৪৪

গান: বিধিব বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান–

তুমি কি এমনি শক্তিমান!

সুর: খাম্বাজ

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

প্রকাশ সাল: ০৭ অক্টোবর ১৯০৫

মূল গান: নেই

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান

তুমি কি এমন শক্তিমান!

আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান

তোমাদের এমনি অভিমান॥

চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে

এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেই টান॥

শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও,

হও-না যতই বড়ো আছেন ভগবান।

আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,

বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান।

গান-৪৫

গান: খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে।

যে আসে তোরই পাশে, সবাই হাসে দেখে তোরে

সুর: বাউল

তাল : দাদরা

স্বরলিপিকার: সরলা দেবী

প্রকাশ সাল: ০৭ অক্টোবর ১৮৯২

মূল গান: নেই

খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে।

যে আসে তোরই পাশে, সবাই হাসে দেখে তোরে॥

জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি।

তারা পায় না বুঝে তুই কী খুঁজে ক্ষেপে-বেড়াস জনম ভরে॥

তোর নাই অবসর, নাইকো দোসর ভবের মাঝে।

তোরে চিনতে যে চাই, সময় না পাই নানান কাজে।

ওরে, তুই কী শুনাতে এত প্রাতে মরিস ডেকে?

এ যে বিষম জ্বালা ঝালাপালা, দিবি সবায় পাগল করে।

ওরে, তুই কী এনেছিস, কী টেনেছিস ভাবের জালে?

তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে?।

আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোরে!

তুই কি সৃষ্টিছাড়া, নাইকো সাড়া, রয়েছিস কোন নেশায় ঘোরে?

এ জগত আপন মতে আপন পথে চলে যাবে

বসে তুই আর-এক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে॥

ওরে ভাই, ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে

মিছে তুই তারি লাগি আছিস জাগি না জানি কোন আশার জোরে॥

গান-৪৬

গান:

সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে?

খাঁটি জিনিস হয় রে মাটি নেশার পরমাদে ॥

সুর:

তাল :

স্বরলিপিকার:

প্রকাশ সাল: ১৭ জানুয়ারি ১৯২২

মূল গান: নেই

সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে?

খাঁটি জিনিস হয় রে মাটি নেশার পরমাদে॥

কথায় তো শোধ হয় না দেনা, গায়ের জোরে জোড় মেলে না

গোলেমালে ফল কি ফলে জোড়াতাড়ার ছাঁদে?।

কে বলো তো বিধাতারে তাড়া দিয়ে ভোলায়?

সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে জাদুকরের ঝোলায়?

মস্ত-বড়োর লোভে শেষে মস্ত ফাঁকি জোটে এসে,

ব্যস্ত-আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশার ফাঁদে॥

সহায়ক গ্রন্থ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সমীক্ষা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬১

অজয় চক্রবর্তী, শ্রুতিনন্দন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯

অরুণকুমার বসু, বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪

অসিত রায়, সংগীত অন্বেষা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৯

আবুল আহসান চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ যুগলবন্দী প্রেক্ষণ, শোভা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, ২৫ বৈশাখ ১৪১৫; ৭ মে ২০০৮।

আবদুশ শাকুর, সংগীত বিচিত্রা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।

ইদ্‌রিস আলী, শতবর্ষের মূল্যায়ন নজরুল সঙ্গীত, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা; এপ্রিল ২০০১

উৎপলা গোস্বামী, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সংগীত, প্রথম খন্ড, দীপায়ন, কলকাতা ৭০০০০৯, ১৩৯৭।

উৎপলা গোস্বামী, ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, ১৯৭১।

এস.এম. লুৎফর রহ্‌মান, বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান, ধারনী সাহিত্য-সংসদ, ঢাকা, অক্টোবর১৯৯০, কার্তিক-১৩৯৭।

এস এম নূর-উল-আলম, চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন- ২০০৩।

ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসঙ্গীত সারি গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- জানুয়ারি- ১৯৯৮।

কল্যাণী কাজী সম্পাদিত, শত কথায় নজরুল, সাহিত্যম, কলকাতা; বইমেলা ২০০৭

গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্তী, ভবা পাগলার জীবন ও গান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৫

গোলাম মুরশিদ, বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত নজরুল জীবনী, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি ২০১৮

ড. করুণাময় গোস্বামী, প্রসঙ্গ বাংলা গান, অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি- ২০০৯।

ড. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা গানের বিবর্তন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৯৩।

ড. করুণাময় গোস্বামী, সংগীত কোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৮৫।

ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, ভাষা ও দেশের গান, অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি- ২০০৫।

ড. আনোয়ারুল করীম, রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, এপ্রিল ২০১৮।

ড. জাহিদুল কবীর, ভাটিয়ালী গানের উদ্ভব ও বিকাশ, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা; একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭

ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী, রবীন্দ্র সংগীত লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব, দি জেনারেল বুকস্, কোলকাতা-৭০০০০৭, কোলকাতা বইমেলা, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার, রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলকাতা ৬, পৌষ ১৩৯৪/ ডিসেম্বর ১৯৮৭।

ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, মুক্তধারা ১০৫৬, অক্টোবর ১৯৭৪।

দেবব্রত দত্ত, সংগীত প্রভাকার, সংগীত তত্ত্ব [শাস্ত্রীয় তথা ভাব সংগীত প্রসঙ্গ]-প্রথমখণ্ড, ব্রতী প্রকাশনী, ডিসেম্বর, ১৯৮৪।

দেবব্রত দত্ত, সঙ্গীত সহায়িকা, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা, ব্রতী প্রকাশনী, ১৯৭৫, ১৯৭৬।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালীর রাগ-সঙ্গীত চর্চা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড।

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, বাংলা গানের ধারা হাজার বছরের বাংলা গান, প্যাপিরাস, ঢাকা; আগস্ট ২০০৫

ভারতীয় রাগরাগিণীর ক্রমবিবর্তন, আশিস পাবলিকেশনস্, কলকাতা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান, ৪৭খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান, ৪৬খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬২।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বদেশ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩১৫।

রশিদুন্ নবী সম্পাদিত, নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা; অক্টোবর ২০১৪

শুভ গুহঠাকুরতা, রবীন্দ্রসংগীতের ধারা, দক্ষিণী প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৬।

শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৮৬।

শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৪, জুলাই ১৯৭২।

শান্তনু বসু, রবীন্দ্রনাথ জীবন ও কর্মকান্ড, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯, জানুয়ারি ২০১৮।

শ্রী অমলেন্দু বিকাশ কর চৌধুরী, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১৯৮৪।

শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস, রবীন্দ্রসংগীত - প্রসঙ্গ, জিজ্ঞাসা পাব্লিকেশন্স্ (প্রা:) লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০০০৯, মাঘ ১৩৬৭।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; কলকাতা ২০০৮

সানজীদা খাতুন, রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯৯।

সন্‌জীদা খাতুন (সম্পাদিত), গীতবিতান তথ্য ও ভাবসন্ধান, প্রথম খন্ড, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫, ৯ ডিসেম্বর ২০১৮।

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, সমকালে বাংলা গান ও রবীন্দ্র সঙ্গীত, প্যাপিরাস, কলকাতা; ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

সুধীর চন্দ, বহুরূপী রবীন্দ্র সংগীত, প্যাপিরাস, কলকাতা ৭০০০৪, জানুয়ারি ২০০৫।

সিতাংশু রায়, সংগীত চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ, চয়নিকা কলকাতা- ৭০০০০৯, বইমেলা'৯৭।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড), কলকাতা, ২০১৪ (৫ম সংস্করণ)।

পবিত্র দাশগুপ্ত, রাগের ক্রিয়াত্মক রূপায়ণ, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৮

Amal Das Sharma, Musicians of India Past and Present, Naya Prakash, Kolkata, 1993

Swami Pragganananda, A Historical Study of Indian Music, Anandadhara Publications, Calcutta, 1965

Bangla Desh Documents, Vol. 2 (New Delhi : Ministry of External Affairs, India, 1972 New York: UN Publication. 1992

Rounaq Jahan, Pakistan, Failure in National Integration, UPL , Dhaka, 1994.

Karunamaya goswami, kazi Nazrul Islam a biography, Nazrul institute, Dhaka, may 2006